মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

মোশাররফ হোসেন খান

www.pathagar.com

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী

মোশাররফ হোসেন খান

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক
এ. কে. এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ISBN 984-842-011-8

প্রথম প্রকাশ
রবিউল আউয়াল ১৪২৩
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৯
জুন ২০০২

প্রচ্ছদ
আল ফালাহ

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ পঁচিশ টাকা মাত্র

Maolana Maniruzzaman Islamabadi Written by Mosharraf Hossain Khan and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Katabon Masjid Campus. Dhaka-1000, First Edition June 2002. Price Taka 25.00 only.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

- আগের কথা ॥ ৫
- জন্ম ও বংশ পরিচয় ॥ ৭
- শিক্ষা জীবন ॥ ১১
- বিবাহ ॥ ১৫
- কর্মজীবন ॥ ১৬
- সংগ্রাম শুরু ॥ ১৮
- বাংলা শেখার প্রয়োজনীয়তা ॥ ২৫
- সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা ॥ ২৭
- সাময়িকপত্র পরিচালনা ॥ ৩৩
- সাহিত্য জীবন ॥ ৩৯
- রচনাপঞ্জী ॥ ৪৩
- রচনার নমুনা ॥ ৪৯
- আরো কয়েকজন সমসাময়িক লেখক ॥ ৫২
- ভাষণ-অভিভাষণ ॥ ৫৪
- ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ॥ ৬১
- রাজনৈতিক জীবন ॥ ৬৩
- ইসলাম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক ॥ ৭০
- আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ॥ ৭৫
- স্মরণীয় সেই দিনগুলি ॥ ৭৯
- আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক বিরল ব্যক্তিত্ব ॥ ৮১
- একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণ ॥ ৮৩
- গোপনে ইশতেহার প্রচার ॥ ৮৪
- কারাবরণ ॥ ৮৫
- পরবর্তী সংগ্রাম ॥ ৮৭
- যখন তিনি ঘুমিয়ে গেলেন ॥ ৮৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আগের কথা

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর পূর্বপুরুষদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন সৈয়দ ফতেহ শাহ।

বাংলার এককালের সুবিখ্যাত এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজধানী গৌড়ে ইসলামাবাদীর পূর্বপুরুষদের আবির্ভাব হয়। ইসলামের বিশ্বজনীন আদর্শ প্রচার ও প্রসারের জন্যে তাঁরা বাংলায় আগমন করেন।

অর্থ-সম্পদের জন্যে তাঁরা ব্যাকুল ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সত্যের মশাল চারদিকে ছড়িয়ে দেবার কাজে নিবেদিতপ্রাণ। জাগতিক মোহ তাঁদেরকে কোনো সময় তাড়িত করতে পারেনি। বরং মানবিক ও আদর্শের কারণে তাঁরা যুক্ত হয়েছিলেন সাধারণ মানুষের সাথে। সবার হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখের সাথী হয়েছিলেন তাঁরা।

ইসলামাবাদীর পূর্বপুরুষ সৈয়দ ফতেহ শাহ ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ একজন সাধক মানুষ। জ্ঞান, বুদ্ধি, দূরদর্শিতা এবং বিচক্ষণতার জন্যে তিনি ছিলেন সেই সময়ে একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর আদর্শিক ও মানবিক দ্যুতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সবার মুখে মুখে ছিল সৈয়দ ফতেহ শাহ'র নাম। সবাই তাঁকে সমীহ এবং শ্রদ্ধা করতো। তাঁর বলিষ্ঠ চরিত্রের কারণে সকলের ভালোবাসা তিনি অর্জন করেছিলেন।

ফতেহ শাহর উন্নত চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে এ দেশের বহু দুর্দশাগ্রস্ত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

কুৎসিত রাজনীতি, ধর্মীয় নিপীড়ন, বর্ণবাদ, যুলম-নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্যে এ দেশের নিম্ন-শ্রেণীর হিন্দু এবং অপরাপর ধর্মের মানুষ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় অস্থির ছিল। তারা কেবলই বাঁচার জন্যে একটি ভালো রাস্তার খোঁজ করছিল।

www.pathagar.com

ফতেহ শাহ এইসব নিপীড়িত মানুষের সামনে ইসলামের সুমহান আদর্শ, মানবতা, ভ্রাতৃত্ব ও কল্যাণের এক আশ্চর্য আলো ফেললেন। অন্ধকারে মুষড়ে পড়া বিক্ষুব্ধ মানুষেরা ফতেহ শাহর ছড়িয়ে দেয়া ইসলামের সেই আলো পেয়ে পুলকিত হয়ে উঠলো। স্বাধীনতা এবং মুক্তির নেশায় তারা পাগলপারা হয়ে গেল। তারা জানলো, ইসলামে কোনো ভেদ-বৈষম্য নেই। উঁচু-নিচুতে কোনো প্রভেদ নেই। সাদা আর কালাতে কোনো তফাৎ নেই। সকল মুমিনের জন্যে পৃথিবীতে একই সম্মান। একই মর্যাদা।

ইসলামের এই মহান সাম্যের আদর্শ এবং নজির পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মে নেই। নেই অন্য কোনো মতবাদে।

ফতেহ শাহর কাছে এসব কথা জানতে পেরে সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি পরিবর্তনের জোয়ার বয়ে গেল। তারা তো সারা জীবন এমনটিই চেয়েছে। আর দেরি নয়। একে একে তারা ফতেহ শাহর কাছে এসে ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সেই অপার শান্তি, সুখ এবং আনন্দের ধারায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

ইসলামে দীক্ষিত এসব নতুন মুসলমানদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার জন্যে ফতেহ শাহ অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি জানেন, শুধু আবেগ দিয়ে নয়, প্রকৃত জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়েই এদেরকে যোগ্য করে তুলতে হবে। কাজটা সহজ ছিল না। তিনি কিছুটা ভাবনায়ও পড়লেন বৈকি!

সৈয়দ ফতেহ শাহর নিকট-আত্মীয় ছিলেন বাদশাহ নসরত শাহ। তিনি ফতেহ শাহর ইসলাম প্রচারে, তাঁর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতায় প্রচণ্ড খুশি হলেন। তাঁকে দায়িত্ব দিলেন শিক্ষার আলো চারদিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে।

বাদশাহ নসরত শাহও ছিলেন অত্যন্ত জ্ঞানী ও মেধাবী। তিনি ফতেহ শাহকে নিয়ে এলেন চট্টগ্রামের ফতেহাবাদে। ষোড়শ শতাব্দীতে।

উদ্দেশ্য, এই এলাকায় ইসলামের দাওয়াত, আদর্শ এবং শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করা।

কাজের সুবিধার জন্যে বাদশাহ নসরত শাহ ফতেহ শাহকে প্রদান করলেন চট্টগ্রামের শাহ চরিত, বাইনজুড়িসহ কয়েকটি মৌজার জায়গিরদারী।

ফতেহ শাহর জায়গিরদারীর কাছারী ছিল পুকুরিয়া পাহাড়ে।

www.pathagar.com

জন্ম ও বংশ পরিচয়

মাওলানা মনিরুজ্জামানের পূর্বপুরুষের পরিচিতি ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। নসরত শাহর কাছ থেকে প্রচুর জায়গির পেয়ে তাঁরা হয়ে উঠলেন বিশাল সম্পদশালী। তাঁদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। শিক্ষায়, জ্ঞানে, আদর্শে, মহানুভবতায় তাঁরা ছিলেন শীর্ষে। সবার দৃষ্টি তখন তাঁদের দিকে। এই প্রভাবশালী ঐতিহ্যবাহী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত বাংলার বিখ্যাত পুরুষ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। সনটি ছিল ১৮৭৫। আগস্ট মাসের শেষ রোববার। জন্মস্থান– পটিয়া থানার আড়ালিয়া গ্রাম। পিতার নাম মোহাম্মদ মতিউল্লাহ। আর মাতার নাম রহিমা বিবি। মনিরুজ্জামান ছিলেন পিতা-মাতার নয়নের মণি। আদরের সন্তান।

মনিরুজ্জামানের জন্মস্থানের এই ঐতিহাসিক গ্রামটিই এখন বাইনজুড়ি নামে পরিচিত।

মনিরুজ্জামানের পিতা মতিউল্লাহ ছিলেন প্রবল শিক্ষানুরাগী। তিনি ফারসী লেখক ও কবি হিসাবেও বিখ্যাত ছিলেন। এলাকায় তিনি মতিউল্লাহ পণ্ডিত নামে সুপরিচিত ছিলেন।

তাঁর জন্মসন ও জন্মস্থান নিয়ে নানা আলোচনার মধ্যে একটি বিতর্কের ছায়া বা একাধিক মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৯৪৫ সালে একটি কবিতায় লেখেন ঃ

'ষাটের উপর আরো দশ বছর
বৃথায় কেটেছে জীবন আমার।'

এ উক্তি থেকে বুঝা যায় যে, উনিশ শতকের মাঝামাঝি কোন সময় তিনি মায়ের কোল আলো করে ভূমিষ্ঠ হন। মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীনের মতের সাথে মুহাম্মদ আবদুল হাই এবং মুহম্মদ এনামুল হকের মতের পার্থক্যটি স্পষ্ট।

www.pathagar.com

অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন ইসলামাবাদীর জন্মসাল ১৯৭৪ বলে উল্লেখ করেছেন। এ মতের পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় এম. সিরাজুল হক, দেওয়ান আবদুল হামিদ, এম. এ. কুদ্দুছ, সৈয়দ মোস্তফা জামাল ও আরো অনেকের লেখায়। এঁরা তাঁর জন্ম তারিখ ১৮৭৪ সালের ২২শে অক্টোবর বলে মনে করেন। সাহিত্যের ইতিহাসে যে মতটি বিবেচিত হয়েছে তা ভিন্ন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ইতিবৃত্তকার মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯৬৮) এই কৃতী পুরুষের ভূমিষ্ঠকাল উল্লেখ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

'মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার অন্তর্গত আড়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।'

পরবর্তীকালের গবেষকগণ তাঁর এ মতটিই গ্রহণ করেন। আবুল ফজল স্পষ্ট উল্লেখ করেন ঃ

'তাঁর জন্ম ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক আঠারো বছর পরে।'

পারিবারিক সূত্রেও জানা যায় যে, ১৮৭৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ রবিবারে তাঁর জন্ম হয়।

মাওলানা মনিরুজ্জামানের পিতা ও মাতা উভয়েই সম্ভ্রান্ত বংশীয় ছিলেন। পিতা মোহাম্মদ মতিউল্লাহ ছিলেন বহু ভাষাবিদ এবং সাহিত্যগুণের অধিকারী। সেজন্য তিনি 'মুনশী মতিউল্লা' বা 'মতিউল্লা পণ্ডিত' নামে অধিক খ্যাতিমান ছিলেন। একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত হয়েও তিনি যত গুণের অধিকারী ছিলেন সাধারণত একজন শিক্ষিত লোকের মধ্যেও ততগুলো গুণের সমাবেশ দেখা যায় না। তিনি আরবী, ফারসী এবং উর্দুতেও যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায়ও গভীর দখল রাখতেন। সেই সময়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ আরবী-ফারসীতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করাকে জ্ঞান ও গৌরবের বিষয় বলে মনে করতেন। মাওলানা মনিরুজ্জামানের পিতা একজন সুশিক্ষিত ও মার্জিত ব্যক্তি ছিলেন এবং সমাজে মর্যাদারও অধিকারী হয়েছিলেন।

এখানেই ইসলামাবাদীর সাহিত্যের উত্তরাধিকারী লাভের মূল উৎসটির সন্ধান পাওয়া যায়।

আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত বংশের। তাঁর

www.pathagar.com

পিতৃপুরুষগণের সম্পর্কে যে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বুঝা যায় যে, বিদেশাগত এক মশহুর আলেম পরিবারের উত্তরপুরুষ হিসাবে মাওলানা মনিরুজ্জামান জন্মগ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের একটি দৈনিক পত্রিকার ভাষ্য ছিল ঃ

'Moulana Muniruzzaman Islamabadi's family history so far traced discloses the fact that originally his forefathers were from a noble family of Middle Eastern Countries and temporarily settled at Fatehabad area in Chittagong district but on later years Khan Mohammad Khan of the family shifted to Aralia in Patiya P.S. under the same district and settled there permanently.'

বংশ তালিকা

[সৈয়দ] ফতেহ শাহ (অপর সূত্র : ফতেহ খান)... [মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত পূর্বপুরুষ]

তার পুত্র : আদিল মোহাম্মদ [খান] (অপর সূত্র : আকেল মোহাম্মদ তরফদার)

তার পুত্র : আমীর মোহাম্মদ [তালুকদার]... [ফতেহাবাদে বসতিস্থাপনকারী]

তার পুত্র : খোসনে মোহাম্মদ (অপর সূত্র : খোশহাল মোহাম্মদ তরফদার)

তার পুত্র : খান মোহাম্মদ (পণ্ডিত)... [আড়ালিয়ায় বসতিস্থাপনকারী]

তার পুত্র : মতিউল্লাহ পণ্ডিত (মুনশী), [এবং অপর দুই ভাই ফাজর আলী পণ্ডিত ও আবুদল জলিল]

প্রথম স্ত্রী (খতিবুন্নেছা)জাত মুনশীর তিন পুত্র :

১. মফিজুল্লাহ, ২. হাকিমুল্লাহ, ৩. বশিরুল্লাহ

দ্বিতীয় স্ত্রী, (রহিমা বিবি)জাত মুনশীর দুই সন্তান :

১. মনিরুন্নেছা

২. [মাওলানা] মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান [ইসলামাবাদী]

তার প্রথম স্ত্রী (আছিয়া খাতুন)জাত দুই পুত্র :

১. শামসুজ্জামান ইসলামাবাদী (সম্পাদক), মৃ. ১৯২৩।

২. কামরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মৃ. ১৯২৫।

দ্বিতীয় স্ত্রী (আফলাতুন্নেছা)জাত চার সন্তান :

৩. বদরুন্নেছা (স্বামী ডা. আবদুল আজিম)।

www.pathagar.com

৪. ছুফী আহমদ আজাদ ইসলামাবাদী (রাজনৈতিক কর্মী : ফরওয়ার্ড ব্লক), মৃ. ১৯৫৭।

৫. মোহাম্মাদ শাহজাহান (মুক্তিযোদ্ধা, সংগঠক, অনুবাদক), মৃ. ১৯৮৬।

৬. বদরুল আলম আজাদ ইসলামাবাদী (মুক্তিযোদ্ধা, 'সমাজ'-সম্পাদক, পৌর কমিশনার)।

ইসলামাবাদীর পুত্রগণের মধ্যে প্রায় সকলেই সাংবাদিকতার সাথে এবং কেউ কেউ সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সাথে ও মুক্তিযুদ্ধে জড়িত ছিলেন। এদের ভূমিকাও স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল। মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর পূর্বপুরুষগণ প্রথম গৌড়ে এসে বসতি স্থাপন করেন। ধর্ম প্রচার ও পণ্ডিত হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের ইচ্ছাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সুলতান নসরত শাহের সাথে আত্মীয়তাক্রমে ও আনুকূল্যে হাটহাজারীস্থ ফতেহাবাদে একজন গাজী হিসাবে সৈয়দ ফতেহ্ শাহ্ বা ফতেহ্ মোহাম্মদ খান-এর প্রথম আগমন ঘটে। ফতেহ্ শাহ্র বিদ্যা-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় গৌড়াধিপতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর বংশধরগণও সুলতানের অনুগ্রহলাভ থেকে বঞ্চিত হননি। অন্য মতে, আমীর মোহাম্মদই ফতেহাবাদে আসেন এবং সেখানে বসতি স্থাপন করেন ও খোসনে মোহাম্মদ পুকুরিয়া, আড়ালিয়া, চরসেবন্দী (চারতি প্রভৃতি) ও বাইনজুড়ি মৌজা লাভ করেন। মাহবুব-উল-আলমের মতে : 'ইসলামাবাদীর পরিবার মূলত ছিলেন আরব। তখনকার আরবরা একদিকে বিস্তীর্ণ নৌ-বাণিজ্য, অপরদিকে ইসলাম প্রচার নিয়ে পৃথিবীর বহু দেশে ঘুরে বেড়াতেন। এই পরিবার সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নসরৎশাহী বিজয়ের সমসময়ে হাটহাজারী থানার ফতেয়াবাদ নামক স্থানে এসে উপস্থিত হন। পরে আড়ালিয়া গিয়ে বসতি স্থাপন করেন।' সৈয়দ মোস্তফা জামাল বলেন, 'তিনি (ফতেহ্ শাহ্) ছিলেন নসরত শাহের বংশের লোক।... তাঁর (ইসলামাবাদীর) পূর্বপুরুষদের জায়গীরদারীর অহঙ্কার ছিল না। তাঁরা পুথিপত্র ব্যাখ্যা করতেন। তাঁদের বংশের শেষ পণ্ডিত আকাম উদ্দীন।'

এ সকল তথ্য-প্রমাণে জানা গেল যে, মনিরুজ্জামানের জন্ম হয়েছিল একটি ঐতিহ্যবাহী পরিবারে। যে পরিবারের অতীত ইতিহাস ও মর্যাদা ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

শিক্ষা জীবন

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় বাড়িতেই। পিতা ও গৃহশিক্ষকের কাছে তিনি প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ফলে অল্পসময়ে তিনি আরবী ও কুরআন শরীফের প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হন।

এরপর তাঁর পিতা তাঁকে উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্যে হুগলি পাঠান।

উচ্চশিক্ষার জন্যে খুব অল্পবয়সে মনিরুজ্জামান কলকাতা যান। কিন্তু তাঁর শিক্ষার পথটি আদৌ মসৃণ ছিল না। ফলে তাঁর শিক্ষা লাভ বাধাপ্রাপ্ত হয়। তবুও তিনি সকল বাধা উপেক্ষা করে অবশেষে ১৮৯৫ সালে হুগলি মাদ্রাসা থেকে কৃতিত্বের সাথে সনদ গ্রহণ করেন।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং বিচক্ষণ।

কুরআন-হাদীসসহ ইসলামের সার্বিক জ্ঞান লাভের জন্যে তাঁর আগ্রহের কোনো সীমা ছিল না।

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর যেমন ঝোঁক ছিলো, তেমনি ছিলো মনীষীদের জীবনেতিহাস, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর বিপুল পরিমাণে আগ্রহ।

পড়া এবং জানাই ছিলো মনিরুজ্জামানের ছাত্রজীবনের একমাত্র নেশা।

কলকাতায় অধ্যয়নকালে তাঁর জীবনে উপমহাদেশের চারজন বিখ্যাত মনীষীর প্রভাব পড়ে। এদের মধ্যে প্রথমজন মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী।

মাওলানা কেরামত আলী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইসলামাবাদীর মৃত্যুর এক বছর আগে রংপুরে ইন্তেকাল করেন।

তিনি অবিভক্ত বাংলায় ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

www.pathagar.com

মাওলানা কেরামত আলী যেমন ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত, তেমনি ছিলেন আমল-আখলাক, তথা ব্যবহারিক জীবনেও মার্জিত।

আমৃত্যু তিনি মানুষের মাঝে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আর এ জন্যে তিনি এখনো আমাদের কাছে সুপরিচিত এবং বিখ্যাত হয়ে আছেন। বিশেষ করে তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামী জীবনের ইতিহাস এখনো আমাদের বুকে সাহস যোগায়।

দ্বিতীয় মনীষী– সৈয়দ আহমদ খাঁ। তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থপতি ছিলেন। এ জন্যে এখনো তিনি ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

মুসলিম শিক্ষা আন্দোলনের আর এক সিংহপুরুষ নবাব আবদুল লতিফ খান।

তিনি আজীবন শিক্ষা প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করে অমর হয়ে আছেন।

এদের প্রত্যেকের জীবনের আদর্শিক বিষয়গুলো কিশোর মনিরুজ্জামানের হৃদয়ে তুমুলভাবে আন্দোলিত হতো। তিনিও এদের জ্ঞান-গরিমা এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতেন।

তবে তাঁর জীবনে অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করেন আর এক অবিস্মরণীয় প্রবাদপুরুষ। তিনি হলেন আল্লামা জামালউদ্দীন আফগানী।

জামালউদ্দীন আফগানী যেমন ছিলেন কর্মবীর, তেমনি ছিলেন দুঃসাহসী।

এই অসামান্য ব্যক্তির প্রত্যক্ষ প্রভাবে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী বাংলার বুকে ঈমান, আদর্শ এবং ত্যাগের মহিমায় জ্বলে ওঠার সাহসে উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন। আর তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি মনিরুজ্জামান নিজেকে তৈরি করতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ছাত্রজীবন শেষ করে তিনিও ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করবেন।

ইসলামাবাদীর শিক্ষা জীবনে তাঁর পিতার প্রভাব ছিল প্রচণ্ড। পিতা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ও ভাষাবিদ পণ্ডিত। পিতা মনিরুজ্জামানকে নিজের মত করে গড়ে তোলার জন্যে প্রথম থেকেই যত্নবান ছিলেন। এই উদ্দেশ্যে আরবী শিক্ষার জন্যে অতি অল্প বয়সে তাঁকে স্থানীয় মাদ্রাসায় ভর্তি করান। হাকিম আলতাফুর রহমান বলেন : 'ঘরোয়া পরিবেশে তিনি ফার্সী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করিয়া উচ্চশিক্ষার জন্য হুগলী মাদ্রাসায় গমন করেন।'

www.pathagar.com

ইসলামাবাদী পাঁচ বছর বয়সে জুনিয়র মাদ্রাসায় কুরআন পাঠ ও মাসলা-মাসায়েল শিক্ষা শুরু করেন এবং বার বছর বয়সে তিনি জুনিয়র পাস করে হুগলী রওয়ানা হন। এই সময় চট্টগ্রামের কয়েকজন নামী শিক্ষক ও পণ্ডিত হুগলী কলেজ এবং মাদ্রাসায় ছিলেন। এদের সহায়তায় ইসলামাবাদী ১৯৮৮ সনে মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে ইমামবাড়ায়, আবার কিছুদিন ইমামবাড়া ছেড়ে ফরাসী চন্দন নগরে থেকে পড়াশুনা করেন। ইমামবাড়ায় তিনি অনেক প্রাচীন বই-কিতাব পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। হুগলী মাদ্রাসা থেকে অল্পকালের মধ্যে সিনিয়র মাদ্রাসা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। এতে তাঁর মনে যথেষ্ট উৎসাহ জাগে। অভিভাবকগণের মনেও আশার সঞ্চার হয়। এখান থেকে তিনি তৎকালীন আরবী শিক্ষার শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হ্যালী মাদ্রাসা বা কলকাতা মাদ্রাসা আলিয়াতে ড. রস (Roos) ও মি. হ্যালীর (Mr. Hally) কাছে উচ্চতর জ্ঞান আহরণের আশায় আগমন করেন। কলকাতায় মাওলানা আকরম খাঁ-র মত তিনিও জামাতে উলা (ফাজিল) পাস করেন। সনটি ছিল ১৮৯৫। 'সনদ' লাভ করে তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ফারসী ভাষায় তিনি মোকতারশীপ পাস করেছিলেন বলেও জানা যায়।

মাত্র সতের বছর বয়সেই মাওলানা ইসলামাবাদী আরবী ও ফারসীতে অগাধ জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হন। তবে তখনো পর্যন্ত ইংরেজি বা বাংলায় তিনি তেমন দক্ষতা অর্জন করতে পারেননি। ফলে চাকুরি লাভের ক্ষেত্রে তাঁকে নিরাশ হতে হলো। পরে উত্তরবঙ্গে শিক্ষকতা করতে এসে আপন চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তিনি ইংরেজিতে কাজ চালাবার মতো জ্ঞান এবং বাংলাতেও বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন।

বিস্ময়ের ব্যাপার বটে, নিজের চেষ্টা ও সাধনায় বাংলা ভাষায় মনিরুজ্জামান এমন দক্ষতা অর্জন করলেন যে, বাংলা ভাষার রূপ কেমন হবে এ বিষয়েও পরে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন। সত্য বটে, ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে এই অসাধারণ একাগ্রতা এসেছে তাঁর পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রেই। আবুল ফজলের মতে ঃ

'মনিরুজ্জামানের পিতা মুনশী মতিউল্লাহও ছিলেন শিক্ষক ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। সে কালের পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষার উপর গভীর দখল

www.pathagar.com

রাখতেন। মনে হয় পিতার কাছেই শৈশবে মনিরুজ্জামানের বাংলা শেখার গোড়াপত্তন হয়েছিল, তখন অবশ্য নিজের চেষ্টা আর সাধনায় তিনি তাতে অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।'

অপর একটি অভিমতে অবশ্য বলা হয়েছে যে,

'মোকতারী আইন পড়িতে উদ্যত হইয়াই তিনি প্রথমতঃ মাতৃভাষা বাঙ্গালা শিখিতে শুরু করেন।'

কিন্তু ইসলামাবাদী বলছেন একটু ভিন্নভাবে। তিনি নিজের লেখায় (১৯৩১) তাঁর শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি ও সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে উল্লেখ করেন ঃ

'এই অধম যখন ১৮৯৫ খৃ. মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরবঙ্গে শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করি, তখন বাংলা সাহিত্য চর্চার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতির উপায় সম্বন্ধে... স্বীয় ক্ষুদ্র শক্তি ব্যয়িত করতে থাকি।'

সে যেভাবেই হোক না কেন, ইসলামাবাদী পরবর্তীকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে যে অনিবার্য প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিলেন, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই।

এ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রহমত থাকলে চেষ্টা, শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে অনেক কিছুই অর্জন করা যায়।

www.pathagar.com

বিবাহ

খুব অল্পদিনের ব্যবধানে পিতা ও মাতার ইন্তেকালে সংসার জীবনে এক দারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়লেন মনিরুজ্জামান। তাঁর এ সময়ের জীবন বড়ই কষ্টের ছিল। পিতার আয়ের ওপর নির্ভরশীল জীবনে সেই প্রথম ছেদ। এদিকে নিজেরও আয়ের তেমন সংস্থান ছিল না। অন্য দিকে অনুদান বা সাহায্য-নির্ভর জীবনের প্রতিও ছিল তাঁর চরম ঘৃণা। সরকারী চাকুরীতেও তাঁর ছিল অনীহা। এর ফলে বেশ কিছু কাল তিনি স্বগ্রামেই অবস্থান করেছিলেন। সম্ভবত তখনই তিনি মোক্তারী পড়াশুনার কথা ভাবতে থাকেন। দেরি না করে কলকাতা গিয়ে হেকিমী শিক্ষাতেও মনোযোগী হতে চেষ্টা করেন।

ইসলামাবাদী বেশ কিছুদিন এইভাবে বেকার জীবনযাপন করেন।

এই সময় বা কিছু আগে-পরে ইসলামাবাদীর জীবনের আরও দু-একটি ঘটনা ছিল উল্লেখযোগ্য। তখন তাঁদের বসতবাড়ি ও স্থাবর জমাজমির বেশ কিছু অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। ফলে তিনি নতুন বাড়িতে উঠে আসেন। বাড়িতে পুরনোকালের যেসব দামী ও ঐতিহ্যবাহী জিনিসপত্র ছিল সেসবও তখন তিনি দান করে দেন। তার মধ্যে ছিল বারো-বেহারার একটি পাল্কী। এটি তিনি পাশের গ্রামের সুজাত আলী মাস্টারকে দিয়ে দেন। এ ছাড়া মায়ের অন্তিম ইচ্ছা পূরণার্থে তিনি এক দরিদ্র জ্ঞাতিভাই মৌলবী তমিজউদ্দিনকে ১২ কাণি সম্পত্তি নিঃশর্তে মৌখিকভাবে দান করেন। সম্পত্তির প্রতি তাঁর যে কখনই লালসা ছিল না এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর এই বেকার ও নির্লোভ জীবনের মধ্যেই তাঁর স্বজন ও বন্ধুবান্ধব বিয়ে করার জন্য তাঁকে তাকিদ দিতে থাকেন। অতঃপর তিনিও সদগুণশালিনী এক বিদুষী কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সনটি ছিল ১৮৯৭। স্ত্রীর নাম আছিয়া খাতুন। আছিয়া ছিলেন অত্যন্ত বুদ্ধিমতী।

মাওলানা ইসলামাবাদীর স্ত্রী তাঁকে ঘাবড়াতে দিলেন না। স্ত্রীর অনুরোধে মাওলানা মনিরুজ্জামান চাকুরীর উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গ গমন করেন।

www.pathagar.com

কর্ম জীবন

সনদ লাভের পর মাওলানা মনিরুজ্জামান কি করবেন, এ নিয়ে বেশ কিছুটা ভাবনায় পড়লেন। সংসার বলে কথা। জীবন-জীবিকার প্রশ্নটি তখন বড় হয়ে দেখা দিল। উপার্জনের বিষয়টি তখন মুখ্য।

তিনি স্বভাবে ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী এবং স্বাধীনচেতা। তার সাথে যুক্ত ছিল দেশপ্রেম। দেশের মানুষের জন্যে কিছু করার বাসনায় তিনি সর্বদা ব্যাকুল হয়ে থাকতেন। তাঁর নিকটাত্মীয়রা চাচ্ছিলেন, তিনি সরকারী চাকুরী করে পরিবারের অভাব দূর করুন। কিন্তু তিনি ছিলেন অন্য প্রকৃতির। অন্য স্বভাবের। কোনো প্রলোভনেও তাঁর মন সায় দিল না সরকারী চাকুরীতে। কেউ তাঁকে প্রলুব্ধও করতে পারলো না সেই ব্যাপারে।

কিন্তু বাস্তবতা ছিল অন্য রকম। সেখানে আবেগের স্থান বড়ই ক্ষণস্থায়ী। দারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে এই সময়ে তিনি বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছিলেন সরকারী চাকুরী। সেটা ছিল অত্যন্ত স্বল্পকালের জন্য। এ বিষয়ে ইংরেজী পত্রিকার এক লেখক, আবুল খায়ের ১৯৬৭ সনে লেখেন ঃ

'Moulana Islamabadi was an employee of the government in the begining of his career but as he declined to oblige the whimsical attitude of his superiors, he had to give up the job.'

কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি হুগলী সরকারী মাদ্রাসাতেই সর্বপ্রথম চাকুরীর প্রস্তাব পান। কিন্তু সেই চাকুরীতে মনিরুজ্জামানের কোনো উৎসাহ দেখা যায়নি। তবুও বাধ্য হয়েছিলেন স্বল্পকালের জন্যে সেখানে কাজ করতে।

১৮৯২ সন। এই সময়ে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মুখোমুখী হলেন কঠিন বাস্তবতার। অকস্মাৎ ইন্তেকাল করলেন তাঁর পিতা। যিনি ছিলেন ছায়াদার

www.pathagar.com

বৃক্ষের মত। মনিরুজ্জামান এতটুকুও প্রস্তুত ছিলেন না এই শোকাবহ ঘটনার জন্যে। পিতার ইন্তেকালের শোক-তাপ ভুলতে না ভুলতেই আবার ইন্তেকাল করলেন স্নেহময়ী মাতা। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পিতা-মাতাকে হারিয়ে শোকের সমুদ্রে ভাসতে থাকলেন মনিরুজ্জামান। তিনি হয়ে পড়লেন অভিভাবকহীন। এই বেদনা তাঁকে দীর্ঘদিন যাবত কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু তারপরই আবার তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই মনিরুজ্জামান ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং মেধাবী। তিনি ছিলেন এক স্বাধীনচেতা দুঃসাহসী পুরুষ।

পরিবারের সবার স্বপ্ন ছিল মনিরুজ্জামান লেখাপড়া শেষ করে চাকুরী করবে। সংসারের হাল ধরবে। কিন্তু মনিরুজ্জামানের চোখে ছিল অন্য স্বপ্ন। সে স্বপ্ন ছিল স্বাধীনতার। সে স্বপ্ন ছিল ঘুমন্ত মুসলমানকে জাগানো।

তিনি অবশ্য শিক্ষাজীবন শেষ করে সরকারী হুগলী মাদ্রাসায় কর্মজীবন শুরু করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি এ চাকুরী করেননি। কারণ তিনি দেখলেন, তাঁর চারপাশে অসংখ্য মুসলমান নিগৃহীত, নিপীড়িত এবং নির্যাতিত হচ্ছে।

এসব মানুষের ভাগ্য বিড়ম্বনায় মনিরুজ্জামানের কোমল হৃদয়ে বেদনার ঝড় বয়ে যায়।

তিনি সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সাধারণ মুসলমানের ভাগ্য পরিবর্তনের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

সংগ্রাম শুরু

মাওলানা মনিরুজ্জামান জানতেন, শিক্ষা ছাড়া মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই চেতনা থেকে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন রংপুরে একটি নিউস্কিম মাদ্রাসা। এখানে তিনি অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

এরপর তিনি বাগদুয়ার এবং সীতাকুণ্ড মাদ্রাসায়ও শিক্ষকতা করেন।

মাওলানা মনিরুজ্জামান কর্ম-জীবনের শুরুতেই মুসলমানের লাঞ্ছনায় মর্মাহত হয়েছিলেন। তাদের ছিলো না কোনো শিক্ষা। ছিলো না বৈভব। ছিলো না কোনো স্বাধীনতা।

তারা ক্রমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল অন্ধকারের অতল গহ্বরে। অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং লাঞ্ছনার নাগপাশ থেকে এ দেশের মুসলমানকে মুক্ত করার জন্যে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

মনিরুজ্জামান খুব ভালো করে বুঝলেন, এ জাতিকে মৃত্যুর থাবা থেকে রক্ষা করতে হলে তাদেরকে যেমন সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে, তেমনি তাদেরকে স্বাধীনতা চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তিনি জানতেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া এ দেশের মুসলমানের ধর্মীয় অস্তিত্ব রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়।

এ জন্যে তিনি জাতিকে ধর্ম, কর্ম, শিক্ষা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে নতুন করে জাগিয়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

শুরু করলেন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ। এ ক্ষেত্রে তাঁর শ্রম ও নিষ্ঠা ছিল যেমন অধিক, তেমনি ছিল অশেষ ধৈর্য। সে ছিল সংগ্রামী জীবনের এক আলোকিত অধ্যায়।

১৮৯৫ সন। মাওলানা মনিরুজ্জামান রংপুর জেলার বাগদুয়ার অঞ্চলের কুমুদপুর মাদ্রাসায় গেলেন। তিনি সংবাদ পেলেন যে, এখানে দ্বিতীয়

www.pathagar.com

মৌলভীর একটি পদ খালি আছে। মাসিক বেতন চল্লিশ টাকা। তিনি সেই বেতনে চাকুরীটি গ্রহণ করলেন। পরবর্তীতে তিনি এই মাদ্রাসার হেড মৌলভীর পদ অলংকৃত করেন। কারো মতে, মনিরুজ্জামান শিক্ষা সমাপ্ত করে রংপুর জেলার হাড়গাছি সিনিয়র মাদ্রাসার সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হন।

এখানে, অর্থাৎ হাড়গাছি মাদ্রাসায় কর্মরত অবস্থায় তিনি বাঙালী মুসলমানদের সার্বিক অবনতি ও দুর্দশায় দারুণভাবে শংকিত হয়ে ওঠেন। তিনি ভাবতে থাকেন দেশ নিয়ে। দেশের অধঃপতিত মুসলিম সমাজ নিয়ে। ভাবতে থাকেন, কিভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করা যায়। কিভাবে জাগানো যায় এই ঘুমন্ত জাতিকে।

ভাবতে ভাবতেই এক সময় খুলে গেল তাঁর চেতনা ও কর্মের দরোজা। তিনি সাহিত্যের মাধ্যমে, লেখনীর মাধ্যমে প্রথমত জাতিকে জাগানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু তার জন্যে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বাংলা ভাষার জ্ঞান তখনো ছিল তাঁর আয়ত্তের বাইরে।

তাই বলে হতাশ ছিলেন না মনিরুজ্জামান। তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার জন্যে কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা শুরু করলেন। শুরু করলেন রাত-দিন ভাষা চর্চা। অবিশ্রান্তভাবে। তাঁর রংপুরের কর্ম-জীবনের এটিই ছিল সবিশেষ বিস্ময়কর ঘটনা।

মনিরুজ্জামান ছিলেন সিদ্ধান্তে অটল, সাধনায় একাগ্র এবং উদ্যম ও পরিশ্রমে অক্লান্ত। তাঁর আদর্শ ও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য ছিল শর্তহীন। যা সত্য, যা ন্যায়, যা দেশ ও জাতির জন্যে কল্যাণকর, তার প্রতি মনিরুজ্জামানের ছিল অকুণ্ঠ সমর্থন। জাতির জন্যে কল্যাণকর কঠিন কাজেও তিনি হাসিমুখে এগিয়ে আসতেন।

মনিরুজ্জামান তখন পেশায় ছিলেন একজন সামান্য শিক্ষক। কিন্তু তাঁর ভেতরে এমন ব্যক্তিত্ব, এমন মেধা ও শক্তি ছিল যে, তিনি আশপাশের সকলের কাছেই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিলেন। স্থান করে নিয়েছিলেন তাদের হৃদয়ে। যখন যেখানেই তিনি কল্যাণকর কাজ দেখেছেন, যেখানেই তিনি ডাক পেয়েছেন– সেখানেই ছুটে গেছেন। কখনো ব্যক্তি-স্বার্থের চিন্তা

www.pathagar.com

করেননি। কখনো খ্যাতি বা মোহের লালসায় ভোগেননি। তাঁর সামনে তখন শুধু একটি মাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল– কিভাবে জাগানো যায় এই মুসলিম জাতিকে।

তাঁর সেই পরিশ্রম বিফলে যায়নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমগ্র উত্তর বঙ্গে পরিচিত ও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন।

ইসলামাবাদীর জীবন-প্রাণ দেশ ও জাতির জন্যে উৎসর্গীকৃত ছিল। কিসে মুসলমানের ভাল হবে, কল্যাণ হবে, কিসে তাদের উন্নতি হবে, কিভাবে তাদের মুক্তি আসবে– সর্বক্ষণ তিনি সেই ভাবনাতেই মশগুল থাকতেন। তিনি বুঝতেন, মুসলমানদের এখন মূল সমস্যা– শিক্ষা, সচেতনতা ও সাহসের অভাব। তিনি নিজেকে মেলে ধরলেন এই সকল সমস্যা দূর করার জন্যে। এ প্রসংগে আবুল ফজলের অভিমতটি স্মরণযোগ্য। তিনি বলেন ঃ

'যুগের প্রয়োজন আর গতিধারা তিনি বুঝতেন। তাই... চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজকে সবদিকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করে তুলতে। তিনি নিজেও খয়রাতি আলেম ছিলেন না– অন্য আলেমদেরও তা করতে চাননি। আলেমরাও স্বাধীন আর স্বাবলম্বী হোক এই তিনি চেয়েছিলেন।'

মাওলানা মনিরুজ্জামান চাকুরীর পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াত ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার জন্যে, সাধারণ মুসলিম পরিবারের মধ্যে সত্যের আলো জ্বালাবার জন্যে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। ইসলামের এই দাওয়াতী কাজের জন্যে তিনি রংপুরসহ গোটা উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছুটে বেড়িয়েছেন। এ সকল অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচারের জন্যে সাময়িক ও স্থায়ী মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেন।

মাওলানা মনিরুজ্জামান রংপুরে থাকাকালেই মূলত ইসলাম প্রচারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এর পাশাপাশি শিক্ষা-বিস্তার, সংস্কার ও সেবামূলক কাজও করতে থাকেন। ইসলামী জলসা, সভা-সমিতিতে এই সময় তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। ক্রমান্বয়ে তিনি বক্তৃতা বা বাগ্মিতায় দারুণ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তাঁর বক্তৃতা শুনার জন্যে বহুদূর থেকে সর্বস্তরের মানুষ সভাস্থলে হাজির হতো। তাঁর বক্তৃতার ভাষা ছিল সরল-সহজ ও প্রাঞ্জল। যার কারণে অতি সাধারণ ব্যক্তিও সেই বক্তৃতার সারমর্ম বুঝতে

www.pathagar.com

পারতেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর বলিষ্ঠ নীতি ও চারিত্রিক গুণাবলীতে গ্রামের সাধারণ মানুষ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে যেতো। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহর মত উপস্থিত বুদ্ধি, যুক্তি এবং বাস্তবতার আলোকে তিনি বক্তৃতার কৌশল আয়ত্ত করেন। ফলে তাঁর বক্তৃতা সকল সময় শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতো।

মাওলানা মনিরুজ্জামান এই সময়ে বিভিন্ন সভা-সমিতি করে মানুষকে ইসলামের পথে, সৎপথে আনার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করতেন। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত রাখার জন্যে সচেতন করতেন। সমাজ-সংস্কারের জন্যে তিনি তাঁর যাবতীয় মেধা ও শ্রম নিয়োগ করেছিলেন।

সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে হানাফী ও মুহাম্মাদী মাজহাবের মধ্যে তর্কযুদ্ধ লেগেই থাকতো। মাওলানা মনিরুজ্জামান বিভিন্ন সভায় উপস্থিত হতেন। তিনি যুক্তির নিরিখে তর্কের মীমাংসা করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হতো যুক্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ। আক্রমণাত্মক ভাষা সর্বদা পরিহার করতেন। ফলে তিনি সকলের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন। সর্বস্তরের মানুষের তিনি শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে ওঠেন।

মাওলানা মনিরুজ্জামানের এই সময়ে একমাত্র স্বপ্ন হয়ে ওঠে মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। তিনি মানুষকে বড় ভালবাসতেন। ভালবাসতেন দেশ, সমাজ এবং ইসলামী জীবন-জিন্দেগী। আর এই আলোকে তার চারপাশকে আলোকিত করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন।

মানুষকে ইসলামের শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্যে মনিরুজ্জামান রংপুরের বিভিন্ন জায়গায় মাদ্রাসা, মক্তব, স্কুল প্রতিষ্ঠার তাকিদ অনুভব করতেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ও প্রেরণায় এই স্বপ্নও এক সময় সফল হয়।

শুধু প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা নয়, সেখানে যেন নিয়ম-নিষ্ঠার সাথে শিক্ষা কার্যক্রম যথারীতি চালু থাকে, সেই ব্যাপারেও তিনি কার্যকরী ভূমিকা রাখতেন।

মনিরুজ্জামানের রংপুর জীবনে আর একটি স্মরণীয় অবদান হলো– মাদ্রাসা শিক্ষার সাথে ইংরেজী, বাংলা, অংক, ইতিহাস, ভূগোলসহ নানাবিধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি। ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপক চর্চার জন্যে

www.pathagar.com

আরও বড় ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন তাঁর এখান থেকেই জেগে উঠতে শুরু করে। পরে যা বাস্তবায়িত হয়েছে।

মাওলানা ইসলামাবাদী ছিলেন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত। কিন্তু জীবন যাপনে ছিলেন অত্যন্ত সরল-সহজ। অনাড়ম্বর। তাঁর সততা, নিষ্ঠা ও নিরাপোষ আদর্শের কারণে তিনি যেমন সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তেমনি বন্ধুত্ব লাভে সমর্থ হয়েছিলেন সেই সময়ের কতিপয় বিখ্যাত ব্যক্তির সাথেও। এদের মধ্যে 'মিহির ও সুধাকর' সম্পাদকদ্বয় যথাক্রম শেখ আবদুর রহিম ও রেয়াজ উদ্দিন আহমদের সাথে ছিলেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বস্তুত তাঁদের হাতেই ইসলামাবাদীর সাংবাদিকতার জীবন শুরু। এই উৎসাহ ও প্রেরণার উৎসমূলে ছিলেন তাঁরা। রংপুরে থাকাকালীন সময়ে ইসলামাবাদী পরিচিত হন সেই সময়ের আর একজন প্রখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ মির্জা ইউসুফ আলীর সাথে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর প্রিয়ভাজনও হয়ে ওঠেন।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন, 'এই সময় তাঁহাকে (মনিরুজ্জামানকে) স্নেহের চক্ষে দর্শন করেন মুসলিম বঙ্গের অবিসংবাদিত নেতা মওলবী মেরায উদ্দিন ও পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দিন মাশহাদী।'

ইসলামাবাদীর জীবনে এঁদের প্রভাব ছিল অসীম। ধীরে ধীরে তাঁর কর্মধারা আরও ব্যাপকতর হয়ে পড়ে। এইসব ব্যক্তির প্রেরণা ও উৎসাহে মনিরুজ্জামান যুক্ত হয়ে পড়েন রাজনীতির সাথে। এই সময় আবার মিহির ও সুধাকরে তিনি রিপোর্টও লিখতে শুরু করেন। বিষয় ছিল কৃষক আন্দোলন সংক্রান্ত। পরে তিনি এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন।

এই সময়ে তখনকার আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে মনিরুজ্জামানের পরিচয় ঘটে। তিনি হলেন সাড়া-জাগানো 'অনল প্রবাহের' কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী। কলকাতা শিক্ষা সম্মেলনে তাঁর সাথে সাক্ষাত ঘটলে দুজনের মধ্যে সম্পর্ক আরো প্রগাঢ় হয়। পরবর্তীতে তাঁরা একে-অপরের বন্ধু হয়ে ওঠেন।

এই একই সময়ের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁ-র সাথেও মনিরুজ্জামানের পরিচয় ঘটে। প্রত্যেকের কাছ থেকেই তিনি সামনে চলার পাঠ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জীবনে তাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার লাভ করেছিল।

www.pathagar.com

সাহসে, স্বপ্নে, জাগরণে, সংগ্রামে, প্রেরণায় ও নিষ্ঠায় তিনি ঐ সকল মনীষীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত হয়েছিলেন।

মাওলানা মনিরুজ্জামানের কর্মজীবনের প্রথম ছিল রংপুর। আর এই রংপুরই হয়ে উঠলো কালে কালে তাঁর ব্যাপ্তি ও বিকাশের মূল কেন্দ্রস্থল। তাঁর এই অভিযাত্রাকে আরও বেগবান করে তুলেছিল রাজশাহীর কীর্তিমান পুরুষ মৌলভী মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর সাথে পরিচয়।

মির্জা ইউসুফ আলী তখন একটি নর্মাল স্কুলের শিক্ষক হিসাবে রংপুরে আসেন। ইসলামাবাদীর প্রায় সমসাময়িক কালে। তাঁর সাথে পরিচয়ের পর থেকেই মুগ্ধ হয়ে যান মনিরুজ্জামান। কারণ মির্জা সাহেব ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ পণ্ডিত। কেউ কেউ মনে করেন, মির্জা ইউসুফ আলী কর্তৃক অনূদিত 'কিমিয়া সাদাতে' মনিরুজ্জামানের ভূমিকাও ছিল অগ্রগণ্য। মির্জা সাহেবকে তিনি এই গ্রন্থ অনুবাদের ক্ষেত্রে নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

মির্জা সাহেবও মনিরুজ্জামানকে একান্ত বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নানাভাবে তাঁকে সহযোগিতা করতেন। মির্জা ইউসুফ তাঁর 'দুগ্ধ সরোবর' গ্রন্থের ভূমিকায় মনিরুজ্জামানের শিক্ষা সমিতি ও ইসলামী মিশন গঠন, চট্টগ্রামের স্টীম নেভিগেশন কোম্পানী গঠনসহ বিভিন্ন কাজের এবং সাংবাদিকতার উন্নয়নে মনিরুজ্জামানের "আপ্রাণ পরিশ্রমের" কথা উল্লেখ করেছেন। এছাড়া রেয়াজ উদ্দিন আহমদের পরামর্শে সাপ্তাহিক 'ছোলতান' প্রকাশ করলে মির্জা ইউসুফ আলী মাওলানা মনিরুজ্জামানকেই তার সম্পাদক হিসাবে মনোনীত করে এক মহান উদারতার পরিচয় দেন। তৎকালীন আর এক বন্ধু আবদুর রসূলও মনিরুজ্জামানের সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ অবদান রাখেন।

রংপুরে শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজসেবা, ইসলাম প্রচারসহ নানাবিধ কাজে মনিরুজ্জামান নিজেকে ব্যস্ত রেখেছিলেন। এখান থেকেই তাঁর কর্মজীবনের অগ্রযাত্রা শুরু। একটি সম্ভাবনাময় ও বিকাশমান প্রতিভারও পরিস্ফুটন ঘটলো রংপুরে। ফলে রংপুর হয়ে উঠলো মনিরুজ্জামানের জীবনের একটি স্মরণীয় ও ঐতিহাসিক কেন্দ্রস্থল।

www.pathagar.com

রংপুর থেকে মনিরুজ্জামান এবার নোঙর ফেললেন সীতাকুণ্ডে। রংপুরের মত এখানেও তিনি তাঁর অভিযানের সাম্পানযাত্রা অব্যাহত রাখলেন। সনটি তখন কত ছিল? সেটা সঠিকভাবে জানা না গেলেও গবেষক আবদুল কাদিরের তথ্যমতে এতটুকু জানা যায় যে, ১৩০৯ সনে (১৯০২ ই.) মনিরুজ্জামান যখন মুসলিম কনফারেন্সের আহ্বান করেন, তখন ইসমাইল হোসেন সিরাজী মনিরুজ্জামানের সঙ্গে উক্ত সীতাকুণ্ড মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন। কেউ কেউ মনে করেন, ১৯০১ সনে মনিরুজ্জামান রংপুর থেকে সীতাকুণ্ডে আসেন। এখানে তিনি অবস্থান করেন ১৯০৪ সন পর্যন্ত।

মনিরুজ্জামানের সীতাকুণ্ডের জীবনও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঘটনাবহুল। তিনি এখানে নানা ধরনের সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে ও ইসলাম প্রচারে আরো বেশী করে তৎপর হয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষকে শিক্ষার দিকে, ইসলামের দিকে, উন্নতির দিকে অগ্রসর করানোর জন্যে তিনি তাঁর শ্রম ও সাধনার সবটুকু নিয়োগ করেন। সেই সময় তাঁর প্রতিষ্ঠিত চট্টলার বিখ্যাত ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল, সীতাকুণ্ড মাদ্রাসা, হাইস্কুল প্রভৃতি আজও তাঁর কর্মধারার সাক্ষ্য বহন করছে। এই সময়ে তিনি অবিভক্ত বাংলার মুসলিম শিক্ষা-কনফারেন্স, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠনের উদ্যোগ, জাতীয় মহাসমিতি গঠনসহ আরও ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

বাংলা শেখার প্রয়োজনীয়তা

জনশ্রুতি আছে যে, মাওলানা মনিরুজ্জামান প্রথম জীবনে বাংলা ভাষা জানতেন না। কিন্তু একথা সবাই স্বীকার করেন যে, তিনি ছিলেন আমাদের সাহিত্যের একজন উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। তাঁর পিতা ছিলেন আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষার একজন প্রখ্যাত কবি। তিনি বাংলা ভাষারও পণ্ডিত ছিলেন। মাওলানা মনিরুজ্জামান নিজের চেষ্টা, শ্রম, অধ্যবসায় ও জাতীয় উন্নতির প্রেরণায় বাংলা ভাষাকে খুব ভালভাবে আয়ত্ত করেন। বাংলা ভাষায় তিনি এতটাই দক্ষতা অর্জন করেন যে পরবর্তীকালে তিনি এই ভাষায় একজন অন্যতম সাহিত্যিকের মর্যাদায় ভূষিত হন।

মনিরুজ্জামান যে মেধাবী ও কৃতি ছাত্র ছিলেন তা আগেই বলা হয়েছে। মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভের পর তিনি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথমত চাকুরী নেন। তারপর একে একে বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় তিনি শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। এর জন্যে বাংলা ভাষা শেখার তেমন কোনো প্রয়োজনই ছিলো না।

কিন্তু মনিরুজ্জামান ছিলেন সচেতন এক জাতীয় বিবেক। তিনি বুঝতেন, জাতির জন্যে কাজ করতে হলে বাংলা ভাষা শেখার কোনো বিকল্প নেই।

এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের আর একটি মূল্যবান অভিমত তুলে ধরছি। তাহলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে। তিনি বলছেন ঃ

"এরা (মনিরুজ্জামানসহ তাঁর সমকালীন সংগ্রামী পুরুষ) সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝতে পেরেছিলেন জাতিকে জাগিয়ে তোলার এক শ্রেষ্ঠতম বাহন হচ্ছে সংবাদপত্র। সংবাদপত্র এ যুগের এক মোক্ষম হাতিয়ার, জাতীয় জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ। এ যুগ-সত্যটিও এসব আদিম নেতারাই বুঝতে পেরেছিলেন সর্বাগ্রে, জাতীয় চেতনা উন্মেষের সেই আদি অবস্থায়। নিঃসন্দেহে তাঁদের শক্তি আর সামর্থ্য অত্যন্ত সীমিত ছিল। তবুও জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এঁরা সংবাদপত্র পরিচালনার মতো গুরু দায়িত্বও নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে দ্বিধা করেননি। প্রকৃত প্রস্তাবে এঁদের হাতেই আমাদের সাংবাদিকতার সূচনা। এঁরা যে শুধু

www.pathagar.com

মাসিক আর সাপ্তাহিক (পত্রিকা) প্রকাশেরই ঝুঁকি নিয়েছিলেন তা নয়, এমনকি সে যুগে দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসও করেছিলেন। এঁরাই সমাজসেবা আর সমাজের ভালো করার উৎস।... যা-ই হোক, সেদিন এ আলিম নেতৃবৃন্দ যে সমাজপ্রীতি আর দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন বাঙ্গালী মুসলমানের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে তা সত্যই স্মরণীয়।"

আবুল ফজলের উক্ত অভিমতের সাথে দ্বিমত পোষণ করার কোন অবকাশই নেই। আর এই জাতীয় প্রয়োজনের তাকিদেই মাওলানা মনিরুজ্জামান বাংলা ভাষা শেখার গুরুত্বটা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এবং আল্লাহর রহমতে এই প্রচেষ্টায় তিনি ঈর্ষণীয়ভাবে সফলও হয়েছিলেন।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ছিলেন ইসলামের পূর্ণাংগ অনুসারী এক বিপ্লবী আলেম।

তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র ইসলামই পারে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং মানুষের কল্যাণের জন্যে ইসলাম ছাড়া আর কোনো ধর্মে এমন যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত বিধান নেই।

এ জন্যে তিনি নিজে যেমন ইসলামের হুকুম-আহকাম মেনে চলতেন, তেমনি জনসাধারণের মধ্যে ইসলামের ব্যাপক প্রচারেরও তিনি চেষ্টা করতেন।

তাঁর ভেতর ছিলো বিশ্ব ইসলামের এক আলোকিত স্বপ্ন।

সেই আলোতে সবাইকে উদ্ভাসিত করার জন্যে মনিরুজ্জামানের প্রচেষ্টার কোনো শেষ ছিলো না।

ইসলামের প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার জন্যেই মনিরুজ্জামান সারাটি জীবন পরিশ্রম করেছেন। সহ্য করেছেন অবর্ণনীয় কষ্ট।

ইসলামী দাওয়াতের এই মিশনকে সামনে রেখেই পত্রিকা প্রকাশ, সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা করেছেন। নিজে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। অন্যদেরকে পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

তিনি নিজে লিখেছেন। তাঁর বইপত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধে তিনি ইসলামের শাশ্বত বিধানেরই কথা বলেছেন। বিশ্ব-শান্তির কথা বলেছেন। কল্যাণের কথা বলেছেন।

মূলতঃ বাংলা ভাষা না শিখলে তিনি একা এতটা কাজ কিছুতেই সম্পন্ন করতে পারতেন না। পারতেন না জাতীয় পর্যায়ে এইভাবে এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে।

www.pathagar.com

সাংবাদিকতা ও সম্পাদনা

একটা জাতিকে জাগানোর জন্যে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ছাড়া জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এবং অগ্রসর করানোও যায় না। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে সংবাদপত্রের কোনো বিকল্প নেই।

এই জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাংবাদিকতা এবং সম্পাদনার জগতে প্রবেশ করেন।

'কিমিয়া সাদাতে'র বাংলা অনুবাদক রাজশাহীর বিশিষ্ট পণ্ডিত মীর্জা ইউসুফ আলী ১৯০৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন সেই যুগের অন্যতম মুখপত্র সাপ্তাহিক 'ছোলতান'। মনিরুজ্জামান এই পত্রিকায় কাজ শুরু করেন। ছয়মাস পর তিনি 'ছোলতান'-এর সম্পাদনা ও পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯২৬ সালে দাঙ্গার সময়ে তিনি সাপ্তাহিক 'ছোলতান'কে দৈনিকে রূপান্তর করেন। মুসলমানদের মধ্যে মনিরুজ্জামানই প্রথম, যিনি বাংলা দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনার গৌরব অর্জন করেন।

প্রাচ্যের প্রবাদপুরুষ আল্লামা জালাল উদ্দীন আফগানীর শিষ্য ইরানের নির্যাতিত নেতা আগা মঈদুল ইসলাম ইংরেজীতে 'মুলক' 'মিল্লাত' এবং উর্দু ও বাংলায় দৈনিক 'হাবলুল মতিন' প্রকাশ করেন। মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন এই পত্রিকার বাংলা সংস্করণের সম্পাদক।

এছাড়া আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাংলার মুখপত্র মাসিক 'আল-ইসলাম' পত্রিকারও তিনি সম্পাদক ছিলেন।

এর বাইরেও মনিরুজ্জামান একাধিক পত্রিকার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯২৮ সালে তিনি নিজ দায়িত্বে দৈনিক 'আম্বর' পত্রিকা প্রকাশ করেন। মাওলানা আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মাদী' পত্রিকারও মনিরুজ্জামান ছিলেন অন্যতম উৎসাহী পরিচালক।

www.pathagar.com

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সম্পাদিত এবং পরিচালিত এসব পত্র-পত্রিকার একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্য ছিল– মুসলিম সমাজের সার্বিক কল্যাণ। ধর্মতত্ত্বের আলোচনা, ইসলামের ব্যাপক প্রচার, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম সম্পর্কিত নানান সংশয় এবং অপপ্রচারের যুক্তিগ্রাহ্য জবাব, সমাজ-সংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের মূলোৎপাটন এবং ইসলামের অনুশীলন ও গবেষণার ব্যাপক চর্চায় মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারে এসব পত্রিকার ভূমিকা ছিলো অসাধারণ।

জাতীয় জাগরণ এবং আযাদী আন্দোলনকে চারদিকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে এসব পত্রিকার ভূমিকা ও অবদান ছিল অপরিসীম।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন একজন মাদ্রাসা-শিক্ষিত মানুষ।

আরবী, উর্দু এবং ফারসী ভাষায় তাঁর অসামান্য দখল ছিলো। তিনি তো ইংরেজী শিক্ষিত লোক নন। এমনকি তখন মাদ্রাসায় বাংলাও শেখানো হতো না। তবু তিনি বাংলা ভাষায় অসাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন।

কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব হলো?

যে মনিরুজ্জামান এক সময় বাংলা জানতেন না, এমনকি বাংলা পত্রপত্রিকা পড়তেও জানতেন না– সেই মনিরুজ্জামান নিজের চেষ্টা আর অধ্যবসায়ে প্রমাণ করলেন যে, চেষ্টার অতীত কিছুই নয়। চেষ্টা এবং পরিশ্রম করলে সবই সম্ভব। সম্ভব সবকিছু আয়ত্তে আনা।

আগেই জেনেছি যে, মনিরুজ্জামান বাংলা ভাষার প্রাথমিক শিক্ষাটা পেয়েছিলেন তাঁরই পিতার কাছ থেকে। এরপর তিনি ভাবলেন, জাতিকে জাগাতে হলে, জাতির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐতিহ্য এবং মুক্তির পথ দেখাতে হলে সেই জাতির ভাষাতেই তাদের সাথে কথা বলতে হবে। তাদের ভাষাতেই তাদেরকে আহ্বান জানাতে হবে। তাদের প্রাণের আকুতি তাদের মুখের ভাষাতেই বলতে হবে। এজন্যে তিনি বাংলা ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন।

মনিরুজ্জামান ছিলেন অসম্ভব প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। তাই খুব স্বল্প সময়ের চেষ্টাতেই তিনি বাংলা ভাষায় অসামান্য দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় তিনি এতই দক্ষ ছিলেন, যার কারণে পরবর্তীতে মনিরুজ্জামান একাধিক পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা করতে পেরেছিলেন।

সম্পাদনার মতো একটি জটিল কাজ চালিয়ে যাওয়া ছাড়াও তিনি এই ভাষাতেই বহু বই লিখেছেন। তাঁর সম্পাদনা এবং লেখা দুটোই সে সময়ে পাঠক ও বিদগ্ধজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি সর্বত্রই সফলতা লাভ করেছিলেন।

মনিরুজ্জামানের এই কৃতিত্ব ছিলো একদিকে যেমন গৌরবের, অপরদিকে তেমনি বিস্ময়ের।

মাওলানা আকরম খাঁ ছিলেন প্রথম থেকেই মনিরুজ্জামানের বন্ধু এবং সহকর্মী। আকরম খাঁও ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ। মাসিক মোহাম্মাদী ও দৈনিক আজাদ সম্পাদনা ছাড়াও আকরম খাঁর আর একটি বড়ো পরিচয়– তিনি ছিলেন একজন বলিষ্ঠ লেখক। তিনিও সম্পাদনা এবং লেখনীতে অসম্ভব কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। অথচ, তিনিও মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছিলেন।

এদের সম্পর্কে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল ফজল। তিনি বলেছিলেন ঃ

"পুরোপুরি আলেম হওয়া সত্ত্বেও এঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন– কারো কারো দখল ছিল অসামান্য ও বিস্ময়কর। এর জন্যে নিঃসন্দেহে এঁদের কঠোর শ্রম স্বীকার করতে হয়েছে। কারণ এঁদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে তখন বাংলা শিক্ষা দেওয়ার তেমন কোন সুবন্দোবস্ত ছিল না। এঁদের হাতেই সে যুগের মুসলিম বাংলা সাহিত্য অনেকখানি রূপায়িত হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।"

ভাবতেও অবাক লাগে যে, মাওলানা মনিরুজ্জামান একজন আরবী শিক্ষায় শিক্ষিত আলেম হয়েও একাধিক বাংলা পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশনার গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলেন কিভাবে?

মনিরুজ্জামান গঠনমূলক যে কোন কাজে ও সামাজিক যে কোন কর্তব্যের আহ্বানে অগ্রণী হয়ে পূর্ণ দায়িত্বে তা সমাধা করতেন। সেজন্যে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদেরও পরোয়া করতেন না। তাঁর কাজের উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তিনি বলতেন,

www.pathagar.com

"ইহাতে হিন্দুদের অসন্তোষের কোনো কারণ নাই।"

মনিরুজ্জামানের প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজকে অতীতের জ্ঞান ও ভবিষ্যতের কর্মপন্থায় সম্মুখ আহ্বানে উজ্জীবিত করা। তাঁর প্রতিটি কাজের ও রচনার মধ্যে এ চিন্তারই সুস্পষ্ট প্রকাশ ছিল। তাঁর পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্রিকাগুলি সম্পর্কেও একথা বলা যায়। আবুল ফজল তাঁর পরিচালিত সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করে বলেন ঃ

"এর প্রতিটি ভূমিকা ছিল মুসলিম জাগরণ, মুসলমানের মনে জাতীয় চেতনা সঞ্চারিত করে দেওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর দেশের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করা।"

ইসলামাবাদী যখন সাংবাদিক জগতে প্রবেশ করেন, তখনকার মুসলিম জীবন ও তাঁর শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ বৈরী ও প্রতিকূল ছিল। তবুও এসব বৈরী পরিবেশ টপকে যাবার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য।

'হাবলুল মতিন' বাদ দিলে 'আল-ইসলামই' মাওলানা ইসলামাবাদীর প্রথম স্বাধীন পত্রিকা। এটি বিশ-শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত হয়। তার আগে প্রকাশিত পত্রিকাসমূহ সংখ্যা বা মান কোনও অর্থেই যথেষ্ট উৎকর্ষ আনতে সক্ষম হয়নি। তবুও এর মধ্যে অধিকাংশ পত্রিকার সাথেই মনিরুজ্জামানের সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। যেমন ছোলতান (১৯০২), নবনূর (১৯০৩), মোহাম্মদী (১৯০৩), বাসনা (১৯০৮), কোহিনূর (১৯১১) ইত্যাদি।

ইসলামাবাদী জানতেন যে, মুসলমান সমাজে সংবাদপত্রের বহুল প্রচলন না হলে কোন আন্দোলনই সার্থক রূপ পরিগ্রহ করবে না। দ্বিতীয়ত, আলেম সমাজের ওপর তাঁর ছিল অগাধ আস্থা। সে যুগে এরাই ছিলেন সমাজে নেতৃস্থানীয় ও ভক্তির পাত্র। এদের কাছে দেশের দুর্দশার বাণী পৌঁছিয়ে দিতে পারলে এবং এভাবে এদেরকে রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমে সুসংঘবদ্ধ করতে পারলে, পঙ্গু সমাজের বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা সহজে সম্ভব হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাই আলেমদেরকে নিয়ে কিভাবে সমাজের ভেতর প্রবেশ করা যায় সেই চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন। তিনি এর একমাত্র পথ হিসাবে সাহিত্যের আশ্রয় নিয়ে তাঁর সহকর্মীদেরও সেই

www.pathagar.com

পথে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। এ কারণেই এঁরা বক্তৃতায়, ইতিহাস চর্চায় ও ইসলামের বাণী প্রচারে সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় অগ্রসর হন। এজন্য এরা বাংলা ভাষাকেই সহজ মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এভাবেই ধর্ম ও জাতীয় চেতনার ক্ষেত্র সৃষ্টিতে এদের এই অবদান আশাতীত ফলপ্রসূ হয়েছিল। এজন্যে কোন কোন সমালোচক বলেন, আমাদের সাংবাদিকতার সূত্রপাত এই আলেমদের হাতে হয়েছিল।

এই পরিকল্পনার মধ্যেই ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবনের ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়– 'আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা' এই পরিকল্পনারই প্রথম বাস্তব ধাপ। ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবনের দিকে তাকাতে গেলে তাঁর এই স্বপ্ন ও সংকল্পের কথাই প্রথমে মনে হয়।

আঞ্জুমানে ওলামার মুখপত্র 'আল-ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করতে গিয়েই ইসলামাবাদীর প্রকৃত সাংবাদিক জীবনলাভ ঘটে। তবে তাঁর হাতেখড়ি হয় আরও আগে। শেখ আবদুর রহিম ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রথম তাঁকে বিভাগীয় রচনা বা ফিচারাদি রচনায় সাহায্য করতেন। আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন,

'মিহির ও সুধাকরের সম্পাদকদ্বয়– মুনশী শেখ আবদুর রহিম ও মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁহার ভিতর আগুনের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য হাত প্রসারিত করিয়াছিলেন।'

মুনশী রেয়াজুদ্দীন পরে ১৮৯৯ সালে 'ইসলাম প্রচারক' নব পর্যায়ে প্রকাশ করলে সে পত্রিকায়ও মনিরুজ্জামান লিখতে থাকেন। এমনি একটি রচনার উদাহরণ– 'প্যারিসে বিশ্ব প্রদর্শনী'।

এই সময় তিনি ইসলাম প্রচারে খুব উৎসাহী হন। ১৩০৬-এর শেষ দিকে একটি সংবাদেও তা জানা যায়। ইসলামের গৌরব প্রচারক ও ইতিহাসমূলক নানাবিধ রচনা এবং ইসলাম প্রচারের জন্যে সংগঠনমূলক প্রস্তাবাবলী, রচনাদি– যা কিছু লিখে পাঠাতেন মিহির ও সুধাকরের সম্পাদকদ্বয় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংশোধন করে তা প্রকাশ করতেন। এ পত্রিকায় তাঁর 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান' ক্রমশ প্রকাশিত হয়। মওলবী মেরাজ উদ্দিন

www.pathagar.com

ও পণ্ডিত মাশহাদী ইসলামাবাদীকে রাজনীতির ক্ষেত্রে সক্রিয় করে তোলেন। এদের আদর্শেই তিনি কৃষক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মিহির ও সুধাকরে এ আন্দোলনের রিপোর্ট 'মুড়ির সূড়া' এই নামে প্রকাশ হতো। কোন হিন্দু পত্রিকাই এ আলোচনা ছাপাতো না, কারণ– তাতে হিন্দু জমিদার, গাঁতিদার, দরগাঁতিদারদের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

মাওলানা মনিরুজ্জামান কাউকে বড় একটা তোয়াক্কা না করে কথা বলার সাহস রাখতেন। আত্মবলে বলীয়ান, এই নির্ভীকচেতা পুরুষকে কখনও সত্য প্রকাশে কুণ্ঠাবোধ করতে দেখা যায়নি।

১৯০৩ সালে রাজশাহীতে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি সীতাকুণ্ড ত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে তিনি তুরস্কের সুলতানের আহ্বানে হেজাজ রেলওয়ের জন্য ব্রহ্মদেশ থেকে চাঁদা তোলার কাজে ও শিক্ষামূলক অন্যান্য কাজে জড়িত হয়ে সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি লক্ষ্য করার সুযোগ পান। এজন্যে তিনি 'ছোলতান' প্রকাশে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং উক্ত সম্মেলনে অনুরূপ প্রস্তাব আনেন। 'ছোলতান' প্রকাশিত হলে ছয় মাস পর তিনি সীতাকুণ্ডের চাকুরী ত্যাগ করে কলকাতা আসেন।

কেউ কেউ মনে করেন, মুনশী রেয়াজুদ্দীন তাঁকে (আবার অন্য মতে, মীর্জা ইউসুফ আলীকে) সে সময় 'ছোলতান' নামে একটি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশের পরামর্শ দেন। 'ছোলতান' কলকাতার কাড়ায়া গোরস্থান লেন থেকে আত্মপ্রকাশ করে।

www.pathagar.com

সাময়িকপত্র পরিচালনা

সাপ্তাহিক সোলতান (১৯০৪)

'সোলতান' প্রথমে সাপ্তাহিক আকারেই আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁর সহকারী সম্পাদক হিসাবে রাজশাহীর জনাব দিওয়ান নাসিরুদ্দীনকে গ্রহণ করেন। তবে জানা যায়, প্রথমাবধি মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর এতে সক্রিয় সাহায্য ছিল এবং সম্পাদক নিজেও তার উল্লেখ করেছেন। ইসলামাবাদীর নিজ উক্তি মতে ৬ মাস পরে (সম্ভবত ১৯০৪ সালে) এই পত্রিকার (সাপ্তাহিক) সম্পাদক হিসাবে তাঁকে পাওয়া যায়।

'সোলতানের' সম্পাদক থাকাকালেই মনিরুজ্জামান ইতিহাস চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং ইসলামের অতীত ঐতিহ্য সন্ধানে ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। তাঁর এ সময়কার গবেষণা– 'ভারতীয় মুসলমান সভ্যতা' নামে প্রকাশিত হয়। 'সোলতানে' প্রকাশিত কবিতা, প্রবন্ধাদি জাতীয় জীবনে অপূর্ব উদ্দীপনা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ পত্রিকার প্রভাব সম্পর্কে তাই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। 'সোলতান' বন্ধ হবার বছরেই 'মোহাম্মদীর' আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সোলতানের আদর্শ ও উদ্দেশ্যই যে তার লক্ষ্য হয় সে বিষয়ে পরবর্তীকালের সমালোচকগণের আলোচনা থেকে স্পষ্টই জানা যায়। এছাড়া অপারপর পত্রপত্রিকার ওপর তার প্রভাব যে কত অপরিসীম ছিল, চৌধুরী শামসুর রহমানের আলোচনা থেকে আমরা তা জানতে পারি। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'সোলতানে'র প্রভাব সম্পর্কে আবুল কালাম শামসুদ্দীন তাঁর 'দৃষ্টিকোণ' গ্রন্থে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, একজন প্রবীণ সাংবাদিকের দৃষ্টিতে সে মূল্যায়নের মধ্যে তার যথার্থ রূপটিই অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

দৈনিক বাংলা 'হাবলুল মতিন' (১৯১২)

'হাবলুল মতিন' জামাল উদ্দিন আফগানীর শিষ্য আগা মঈদুল ইসলামের প্রতিষ্ঠিত একটি পত্রিকার নাম। মুসলিম বাংলার পত্রপত্রিকাগুলির মধ্যে এটি অন্যতম। বাংলা, ইংরেজী ও ফার্সী ভাষায় যথাক্রমে মনিরুজ্জামান, ডক্টর আবদুল্লাহ আল মামুন সোহরাওয়ার্দি এবং স্বয়ং আগা সাহেব কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। পারস্য দেশের আগা সাহেব একজন রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে কলকাতায় আসেন এবং সেখানে স্বীয় বাসস্থান নির্মাণ করেন। অল্পকালের মধ্যেই একজন বিদেশাগত ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকাটি বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ জীবনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তার তুলনা পাওয়া কঠিন। পরবর্তীকালের সমাজ আন্দোলন ও বিশেষ করে প্যান-ইসলামবাদ প্রচারের জন্যে এই পত্রিকার ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় বিভিন্ন সময় অন্তত তিনটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এজন্যেও তাঁকে বলা হয়ে থাকে 'বাংলা দৈনিক পত্রিকার প্রথম মুসলমান সম্পাদক।'

আল-এসলাম (১৯১৪)

'আঞ্জুমানে ওলামার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত 'আল-এসলাম' মাওলানা মনিরুজ্জামানের জীবনের অন্যতম কীর্তি। বলা হয়, উত্তরবঙ্গের এক সভায় মীর্জা ইউসুফ আলীর অসাধারণ বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে মনিরুজ্জামান এই পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প গ্রহণ করেন। মুখ্যতঃ মনিরুজ্জামানই এর প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু প্রথম প্রথম পত্রিকায় তাঁর নাম থাকতো না। এ বিষয়ে কয়েকটি মত এইরূপ :

মুহম্মদ বরকতুল্লাহ জানান, "আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার তত্ত্বাবধানে, উহার মুখপত্ররূপে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণে এতে সম্পাদকের নাম ছাপা হতো না। কিন্তু আসলে সম্পাদনা করতেন মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।"

জনাব আবুল ফজল তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন, "পত্রিকাটির অঙ্গে সম্পাদক হিসাবে কারো নাম ছাপা হতো না বটে তবে সবারই জানা ছিল নেপথ্য

www.pathagar.com

থেকে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীই যাবতীয় সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালন করতেন বেনামীতে।"

১৯৬২ সালে প্রকাশিত আবুল ফজলের এক প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, "আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালার প্রধান কীর্তি তার মুখপত্র 'আল-এসলাম' পত্রিকা। আঞ্জুমানের সেক্রেটারী, জয়েন্ট সেক্রেটারী ও এসিসটেন্ট সেক্রেটারী যথাক্রমে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খান, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং বর্তমান লেখক (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্) ছিলেন পত্রিকার সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক।"

দৈনিক সোলতান (১৯২৬)

মাওলানা মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক ছোলতান' বহুল আলোচিত হলেও দৈনিক 'সোলতান' ততখানি গুরুত্ব পায়নি।

সাপ্তাহিক ছোলতানের তৃতীয়বার চালু হবার অল্প কিছুকালের মধ্যেই পত্রিকাটির একটি দৈনিক সংস্করণ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সেই মতে ১৯২৬ সালে পত্রিকার প্রথম সংখ্যার আত্মপ্রকাশ ঘটে। তারপর প্রায় পাঁচ বছর অব্যাহতভাবে প্রকাশিত হয়ে ১৯৩১ সালে এর বিলুপ্তি ঘটে। এর কার্যালয় ছিল মীর্জাপুর স্ট্রীটে ও পরে চট্টগ্রামে।

দৈনিক আমীর (১৯২৬)

'আল এসলাম' প্রকাশের শেষ দিকে মনিরুজ্জামান আকরম খাঁর সাথে মোহাম্মদী প্রভৃতিতে কিছুকাল আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং এভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টাকে আরো ব্যাপকতর ভিত্তিতে গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছিলেন। 'দৈনিক সুলতান' প্রকাশের পর সম্ভবত তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনকে কিছুটা সংহত করে আনতে হয়েছিল। কিন্তু উক্ত পত্রিকা শেষ পর্যন্ত নানা গোলযোগে বন্ধ হয়ে গেলেও তাঁর উদ্দেশ্যকে তিনি হারিয়ে যেতে দেননি। আর্থিক অনটন থাকা সত্ত্বেও তিনি সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর শেষ চেষ্টার ফল 'দৈনিক আমীর' উপহার দিয়ে তাঁর অগণিত ভক্তের শ্রদ্ধাভাজন হন। এটিই সম্ভবত তাঁর শেষ পত্রিকা প্রকাশ। এরপর সাংবাদিক জীবনের সাথে তাঁর সম্পর্ক খুব একটা ছিল বলে জানা যায় না।

www.pathagar.com

বিবিধ

মাওলানা মনিরুজ্জামান সরাসরি যেমন কতকগুলি পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করে মুসলিম সাংবাদিক জীবনের ব্যাপকতর অনুশীলনের পথ নির্মাণ ও সুগম করেছিলেন, পরোক্ষভাবেও তেমনি নানা প্রতিষ্ঠান ও পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে তার উৎসাহ প্রদানে সাহায্য করেছেন। তিনি জানতেন, পত্রিকা ব্যতীত জাতির ভাগ্য অন্ধকারময়। এজন্যে যা কিছু করার প্রয়োজন তিনি যেন একাই তা সব্যসাচীর মতো করে গেছেন। বিভিন্ন ভাষায় অধিকার থাকার ফলে তিনি এ কাজ অতি সহজেই সমাধা করতেন। মাওলানা অকরম খাঁ ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছিলেন তাঁর সহযোগী বা সহকর্মী। আবুল ফজল বলেন, "গোড়া থেকেই এঁরা ছিল সহকর্মী এবং একসাথেই এঁরা বহু প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতাও।"

এভাবেই ১৮১৯ সালে আকরম খাঁ 'মোহাম্মদী' প্রতিষ্ঠাকালে মাওলানা মনিরুজ্জামানের সহযোগিতা কামনা করলে ইসলামাবাদী তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গে এসে যোগদান করেন।

মাওলানা ইসলামাবাদী কৃষক আন্দোলনের সাথে প্রথমাবধিই জড়িত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে কৃষক প্রজাপার্টির প্রার্থী হিসাবে আইন সভায় সদস্যও নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে পার্টি থেকে 'দৈনিক কৃষক' 'দৈনিক নবযুগ' প্রকাশিত হলে, এগুলোর সাথেও তিনি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট হন।

অন্যান্য যেসব পত্রিকার সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে 'বাসনা', 'কোহিনূর', 'ইসলাম প্রচারক', 'মিহির ও সুধাকর', 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা' প্রধান। মিশরের 'আল মিনার', 'আল এহ্রাম' প্রভৃতি পত্রিকায়ও তিনি প্রবন্ধ এবং সংবাদাদি পাঠাতেন। সেসব পত্রিকার সংবাদাদিও 'আল এসলাম' ও অন্যান্য পত্রিকায় পরিবেশন করতেন। যেমন, মিশরে আরবীতে গীতাঞ্জলির অনুবাদের সংবাদ 'আল এসলাম', পৌষ, ১৩২৬ সংখ্যায় পাওয়া যায়। চট্টগ্রামেও তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের প্রকাশিত বহু পত্রিকার সাথে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। যেমন 'সত্যবার্তা'। ১৯৩৪ সালে তিনি 'সত্যবার্তা'র পরিচালনা কমিটির সভাপতি হন।

www.pathagar.com

মাওলানা ইসলামাবাদী যে উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র পরিচালনা করেন, তা অতি মহৎ। সে দায়িত্ব ছিল অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজে তাঁর আন্তরিকতাই কেবল সম্বল ছিল না, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরীক্ষায়ও তিনি পেছনে পড়েননি। তাঁর পত্রিকার প্রচারসংখ্যা থেকেও তা অনুমান করা যায়।

সেকালে লেখার জন্যে কোন পারিশ্রমিক দেওয়ার রীতি ছিল না, সম্ভবও হতো না। প্রচণ্ড অর্থ-কষ্টের মধ্যে পত্রিকাগুলি কোনরকমে আত্মপ্রকাশ করতো। বরাবরই পত্রিকা প্রকাশের জন্যে কোন নবাব-জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকদের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছে। ইসলামাবাদীও তাই করেছেন। কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বিলীন করে নয়। প্রয়োজনে তিনি সে পত্রিকার স্বত্ব ত্যাগ করে এসেছেন এবং নতুনভাবে অন্য আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কাগজে কিছু বিজ্ঞাপন মিললেও ক্রমে সে অবস্থার অবনতিই ঘটে। 'দি মুসলমান' সম্পর্কে জানা যায়, ১৯১৬-তে দেশী কাগজ ব্যবহার অসম্ভব হয়ে উঠলে তখন অমসৃণ বিলাতী কাগজে পত্রিকাটি ছাপা হতো। ফলে পত্রিকার দামও বাড়াতে বাধ্য হতে হয়। যুদ্ধোত্তরকালে পত্রিকাটি লিমিডেট কোম্পানী করে যখন নেওয়া হলো, তখনও দেখা গেল যে, 'দি মুসলমানের' ভাগ্যে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। 'আল এসলাম' সম্পাদক আষাঢ়, ১৩২৬-এ উল্লেখ করেন :

"বিগত ২০/২৩ বৎসরের মধ্যে ইংরেজী বাঙ্গালার চর্চা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু জাতীয় জীবনের অধঃগতি ব্যতীত যে উন্নতি হইয়াছে তাহার কোনই প্রমাণ নাই। সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়ে নাই বরং গ্রাহক সংখ্যা কমিয়াছে। 'সুধাকর', 'মিহির ও সুধাকর' ও 'সুলতানের' তুলনায় বর্তমান 'মোহাম্মদী' ও 'মোসলেম হিতৈষী'র গ্রাহক-সংখ্যা কম। পূর্বের তুলনায় বর্তমান মোহাম্মদীর বর্তমান গ্রাহক সংখ্যা কম। 'হিতৈষীর' কথাও তাই। 'দি মুসলমানের' গ্রাহক সংখ্যা বিগত ১০/১২ বৎসরের মধ্যে তেমন কিছুই বাড়ে নাই। বহু মাসিক পত্রের অবসান হইয়াছে।"

এমন একটি কঠিন পরিবেশের মধ্যে ইসলামাবাদী পত্রিকার পর পত্রিকা প্রকাশের দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে গেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামাবাদীর অন্যান্য পত্রিকা ও গ্রাহক সংখ্যা কম ও আর্থিক সঙ্কট থাকা সত্ত্বেও কখনো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে তিনি পত্রিকা প্রকাশের চেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তবে একথা ঠিক যে, পত্রিকা প্রকাশ কালে তিনি নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে চাইতেন না বলে বহু পাঠক ও অনুরাগীকে হারান। কিন্তু তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি বা তার কোনো আঁচড়ও তিনি তাঁর পত্রিকার ওপর লাগতে দেননি।

ইসলামাবাদী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সত্যিই এক কিংবদন্তিস্বরূপ। মুসলমানদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশের এক ব্যাপক আন্দোলন তিনি গড়ে তোলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীকালে 'তবলীগ' (১৯২৭), 'মুয়াজ্জিন' (১৯৩০), 'আল ইসলাম' (১৯৩২), 'রওশন হেদায়েত', 'আলোক' প্রভৃতি ধর্মীয় ও অন্যবিধ সাময়িকীর উদ্ভব ঘটে।

বাঙালী মুসলমানদের আত্মসচেতন করার জন্যে তিনি যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি। মুহম্মদ আবদুল হাই তাই মন্তব্য করেন, "বাঙালী মুসলমানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও জাতি হিসাবে তার হৃত গৌরব ফিরে পাবার জন্য তাঁর যে স্বপ্ন ও সাধ ছিল তাকে যথারীতি প্রতিষ্ঠা করার সাধ্য হয়ত তাঁর ছিল না– কিন্তু তাঁর সে বলিষ্ঠ চিন্তা তাঁর কীর্তিলতার মধ্যে আজো সুস্পষ্ট হয়ে রয়েছে।"

www.pathagar.com

সাহিত্য জীবন

যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে মনিরুজ্জামান সম্পাদনা, সাংবাদিকতা ও বক্তৃতাকে বেছে নিয়েছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি তাঁর লেখনী পরিচালনা করেন।

একটা আন্তর্জাতিক বিবেক মনিরুজ্জামানকে প্রতিনিয়ত তাড়া করে ফিরতো।

মুসলমানের অধঃপতন এবং সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট তাঁকে জর্জরিত করতো। মুসলমানের এসব লজ্জা ঢাকবার জন্যে মনিরুজ্জামান বলিষ্ঠ হাতে কলম ধরেন।

তিনি সেই সময়ের বিখ্যাত পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধাদি লিখতেন। এর মধ্যে আছে মিহির ও সুধাকর, ইসলাম প্রচারক, মোহাম্মদী, সোলতান, নবনূর, আল ইসলাম প্রভৃতি।

কলকাতার আনন্দ বাজার, বিভীষণ এবং দিল্লী ও লাহোরের বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মনিরুজ্জামানের লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হতো। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের একজন শক্তিশালী লেখক।

সম্পাদনা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন একজন বিখ্যাত, তেমনি লেখালেখির জগতেও মাওলানা মনিরুজ্জামান ছিলেন এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বাংলা, উর্দু ও আরবী ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। যার কারণে মাওলানা এই তিনটি ভাষাতেই লিখতেন। তাঁর লেখার পরিমাণও ছিল অধিক।

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানের জাগরণ। সমসাময়িক কালে সকল রাজনৈতিক ঘটনার সঙ্গে সংযোগ রেখেই লেখাকে তিনি সেভাবে উপস্থিত করেছেন। একটা স্থির সংকল্প

www.pathagar.com

নিয়েই তিনি এগিয়েছেন। কিন্তু যে পথে গেছেন সে পথ ছিল কঠিন, কেননা তা ছিল কঠোর সংগ্রামের পথ। এই সংগ্রামব্রতী হয়েই তিনি মুনশী মেহেরুল্লাহ্ বা ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং সৈয়দ আহমদ প্রমুখের সঙ্গে তুলনীয় হন। মুহম্মদ আবদুল হাই বলেন,

"ওহাবী আন্দোলনের প্রভাব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকের বিংশ শতকের গোড়ার দিকের মুনশী মেহেরুল্লাহ্ ও শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ সাহিত্যিকের ওপর যেমন পড়েছে... (তেমনি) বঙ্গভঙ্গ যেন রদ না হয় সেজন্য সে কালের কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যে একটা যে সচেতনতা ছিল ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনায় তার কিছু আভাসও পাওয়া যায়।"

সমাজ চিন্তা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে আত্মদানের তাকিদেই সাহিত্যিক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনের ভাষায় :

"মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মুসলমান সমাজকে সামগ্রিকভাবে পুনরুজ্জীবিত করিবার অভিপ্রায় লইয়াই বঙ্গ সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।"

বস্তুত সাংবাদিকতা করার মাধ্যমেই তাঁর মধ্যে সাহিত্যের স্ফুরণ ঘটে। আবদুল গফুর সিদ্দিকী, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবনের প্রারম্ভিক ঘটনার বিবরণ দেন এইভাবে :

"মরহুম মাওলানা ইসলামাবাদীর সাংবাদিক জীবন আরম্ভ হয় 'মিহির ও সুধাকরে'। মিহির ও সুধাকরের সম্পাদকদ্বয় মুনশী শেখ আবদুর রহিম ও মুনশী মোহাম্মদ রিয়াজুদ্দিন আহমদ তাঁহার ভিতর আগুনের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। তিনি (ইসলামাবাদী) মিহির ও সুধাকরে প্রকাশার্থে যে সকল সমাজ হিতকর রচনা প্রেরণ করিতেন, আবশ্যকানুরূপভাবে আবদুর রহিম ও রিয়াজুদ্দিন তাহা সংশোধন ও পরিবর্তন করিয়া মিহির ও সুধাকরে প্রকাশ করিতেন।"

আর মাওলানা ইসলামাবাদী নিজের রচনা ও সাহিত্য সাধনার বিষয়ে বলেন :

"এই অধম যখন ১৮৯৫ খৃ. মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উত্তরবঙ্গে

www.pathagar.com

শিক্ষকতা কার্যে আত্মনিয়োগ করি, তখন বাংলা সাহিত্য চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় উন্নতির সম্বন্ধে কলিকাতার তৎকালীন মোছলেম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র *মিহির ও সুধাকরে* ধারাবাহিকরূপে নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশে স্বীয় ক্ষুদ্রশক্তি ব্যয়িত করিতে থাকি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মুনশী রিয়াজুদ্দিন আহমদ ছাহেব সম্পাদিত *এছলাম প্রচারক* মাসিক পত্রে এছলাম মিশন সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম আমার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।"

সুতরাং ১৮৯৫ সালে তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয় এটা নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়। তিনি বলেছেন, প্রথম তিন বছর তিনি নানাবিধ প্রবন্ধ লিখেছেন এবং তারপরই ১৮৯৮ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত মৌলিক প্রবন্ধ "এছলাম মিশন" প্রকাশিত হয়।

ইসলামাবাদীর এই নানাবিধ প্রবন্ধরাজির মধ্যে ইতিহাস, ইসলাম ও কৃষক-আন্দোলন বিষয়ক প্রতিবেদন এবং কিছু অনুবাদমূলক লেখার কথা জানা যায়। আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতে 'মিহির ও সুধাকরে' তিনি এ জাতীয় রিপোর্ট লিখতেন। ইসলামাবাদী আত্মজীবনিতে লিখেছেন, এই সময় তিনি দেশের 'একচেটিয়া মুফতি'র ভূমিকা নিয়ে কাগজে ধর্ম সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব লিখে পাঠাতেন। ইসলামাবাদী তাঁর সে সমস্ত রচনা (মছলা তলব), নিবন্ধ ও অনুবাদ কোনও গ্রন্থে স্থান পেয়েছে কিনা তা জানার তেমন কোনো সুযোগ নেই। তবে 'ইসলাম প্রচারকে' প্রকাশিত তাঁর কিছু লেখা পরে 'আল-এছলামে' পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। এই সময়ই তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থত্রয় ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান, খগোল শাস্ত্রে মুসলমান ও ভারতে মুসলমান সভ্যতা-এর পরিকল্পনা ও রচনার কাজ শুরু করেন। ১৮৯৬ সালে কলকাতার এক শিক্ষা-সম্মেলনে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সাথে আলাপ ও 'মিহির ও সুধাকরে' প্রকাশিত তার একটি পত্রে জানা যায়, "আমি পরবর্তী যুগে 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' নামক পুস্তক লিখিয়া মুসলিম শাসন যুগের কলঙ্ক মোচন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম।" এইভাবে তিনি অন্যান্য গ্রন্থের পরিকল্পনাও গ্রহণ করেন।

ইসলামাবাদী রংপুর কুমেদপুর থাকতেই তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'তুরস্কের সুলতান' (১৯০১) প্রকাশ করেন। পরবর্তী দুই দশক ছিল তাঁর সবচেয়ে সৃষ্টিশীল

www.pathagar.com

কাল। এই সময় তিনি অজস্র লিখেছেন এবং একাধিক সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেছেন।

তিনি অতীত ঐতিহ্যকে উপস্থিত করতে ও যুব সমাজের ভগ্ন বুকে আশার প্রদীপ জ্বালাতেই এসেছিলেন, এবং সেই দায়িত্ব পালনেই তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাতেই তিনি ছিলেন তৃপ্ত।

ইসলামাবাদী বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তথ্যবহুল এমনকি গবেষণামূলক রচনাও রেখে গেছেন। দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে স্বল্প আয়তনের গ্রন্থেও তিনি যে তথ্য উপস্থিত করেছেন এবং সাথে তার যে যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ যুক্ত করেছেন তা বিস্ময়কর। তাছাড়া বিভিন্ন রচনায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষানীতি, শিক্ষাপ্রদান-প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সমালোচনা ও সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর উচ্চ চিন্তা ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ফল। তিনি পৃথিবীর ও গ্রহ-নক্ষত্রপুঞ্জের যেসব তথ্য উপস্থিত করেছেন এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির, ভূগোল ও খগোল শাস্ত্র তথা জ্যোতির্বিদ্যার এবং নগর তত্ত্বের খুঁটিনাটি বিবরণসমূহ, মধ্যযুগীয় মনীষীদের অবদানের কথা যে মুন্সীয়ানার সাথে উল্লেখ করেছেন, তা এ যুগেও বিস্ময়ের ব্যাপার।

তাঁর গ্রন্থ ও রচনার তালিকাটি সামনে রাখলে আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সত্যিই কত বিচিত্র বিষয়ে, কি বিপুল পরিমাণ তিনি লিখেছেন।

www.pathagar.com

ইসলামাবাদীর রচনাবলী (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত)

গ্রন্থ তালিকা

১. অভিভাষণ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন), বসির হাট, ১৩৩৪ (১৯২৮)
২. আইন সভার আমলনামা
৩. আওরঙ্গজেব
৪. আওলিয়া-দরবেশ কাহিনী (অপ্রকাশিত)
৫. আত্মজীবন
৬. আত্মজীবন
৭. আসাম-ভ্রমণ
৮. ইবনে বতুতার বাংলা ভ্রমণ
৯. ইসলাম ও রাজনীতি
১০. ইসলাম ও জেহাদ
১১. ইসলাম ও স্বাধীনতা (অপ্রকাশিত)
১২. ইসলাম জগতের অভ্যুদয়
১৩. ইসলাম প্রচার
১৪. ইসলামের উপদেশ
১৫. ইসলামের নব জাগরণ
১৬. ইসলামের নীতি কথা
১৭. ইসলামের পুণ্য কথা
১৮. ইসলামের শিক্ষা [সূত্র : ইসলামাবাদী স্মৃতি সমিতি স্মরণিকা ১৯৬৬]
১৯. এছলাম জগতের অভ্যুত্থান (১ম ভাগ), ১৯২৫?
২০. এছলামের প্রচার নীতি
২১. এছলামের শিক্ষা (সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত)
২২. ওলি কাহিনী (প্রকাশগত তথ্য অস্পষ্ট)

www.pathagar.com

২৩. কনষ্টান্টিনোপল (১ম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৩১৯)
২৪. কারাকাহিনী (পাণ্ডুলিপি আকারে হারানো যায় অথবা বাড়ীতে আগুন লেগে পুড়ে যায়)
২৫. কোরআন ও বিজ্ঞান (ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত, ১৩২৩)
২৬. কোরআন ও রাজনীতি
২৭. কোরআনে স্বাধীনতার বাণী, কলিকাতা, ১৯৩৯ (দ্বিতীয় মুদ্রণ, চট্টগ্রাম, ১৯৮০)
২৮. খগোল শাস্ত্রে মুসলমান (১৯১১-১২)
২৯. খাজা নেজামুদ্দিন আওলিয়া, কলিকাতা, ১৩২৩ (১৯১৬)
৩০. চট্টগ্রাম দক্ষিণ সদর মহকুমা ওলামা ও কৃষক কনফারেন্স (অভিভাষণ), ১৯৩৯ (৩২ পৃষ্ঠা)
৩১. জীবন চরিত
৩২. তাপস কাহিনী
৩৩. তুরস্কের ইতিহাস (১ম খণ্ড)
৩৪. তুরস্কের বৃহৎ ইতিহাস, ১৯১৮?
৩৫. তুরস্কের সুলতান (১৯০১) রংপুর বৈশাখ ১৩০৮
৩৬. তুরস্কের সুলতান মহামান্য আবদুল হামীদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক কার্য বিবরণী (সঙ্কলিত, ১৯০১)
৩৭. নিম্নশিক্ষা ও শিক্ষা কর, (কলিকাতা ও চট্টগ্রাম, ১৯৪০)
৩৮. পাক-ভারতের আজাদী সংগ্রামে মুসলমানদের দান
৩৯. পৌরাণিক ও বৈদিক যুগ
৪০. পৌরাণিক ও বৈদিক যুগ, (২য় খণ্ড)
৪১. প্রবন্ধ সংকলন
৪২. বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের জাতীয় উন্নতির উপায় (হ্যারিসন রোড, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত)
৪৩. বাংলার ওলি কাহিনী
৪৪. বাংলার মুসলমান সমাজ ও উন্নতির উপায়
৪৫. ভারত-আরব সম্পর্ক
৪৬. ভারত-বর্মা ভ্রমণ কাহিনী
৪৭. ভারতে এছলাম প্রচার (কলিকাতা, ১৯১৫)

www.pathagar.com

৪৮. ভারতে মুসলমান সভ্যতা (কলিকাতা, ১৯১৪)?
৪৯. ভারতের সহিত আরবগণের প্রাচীন সম্বন্ধ (১ম ও ২য় খণ্ড)
৫০. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে মুসলমান (সূত্র : ই. স্মৃতি সমিতি, স্মরণিকা, ১৯৬৬)
৫১. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম
৫২. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের অংশ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
৫৩. ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান (১৯১১-১২)
৫৪. মোহাম্মদীয় ধর্ম সোপান
৫৫. মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার (সূত্র : ভূমিকা, খাজা নেজামুদ্দিন আওলিয়া) (১৯১৫)?
৫৬. মুসলমানদের সুদ সমস্যা ও অর্থনীতির মৌলিক সমাধান (১৩১৫)
৫৭. মুসলমানের অভ্যুত্থান
৫৮. মোসলেম বীরাঙ্গনা (দ্র. আল-এসলাম ১৩২২; পরে অন্যান্য পত্রিকায়ও পুনর্মুদ্রিত) (১৯১৫)?
৫৯. রাজনীতি ক্ষেত্রে আলেম সমাজের দান
৬০. রোজনামচা
৬১. শুভ সমাচার
৬২. শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান (১৯১৫)
৬৩. শেষ নবী (বিজ্ঞাপিত)
৬৪. সমাজ সংস্কার, ১৩২৬ (অন্য মতে ১৯২১)
৬৫. সুদ সমস্যা ১৩১৫ (?)
৬৬. স্পেনের ইতিহাস
৬৭. হজরতের (দঃ) জীবনী/হজরতের জীবনের আদর্শ
৬৮. হতাশ জীবন/'আত্মজীবনী'র অংশ (?)

বিবিধ রচনাবলী

১. মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর সাথে 'কিমিয়া সায়াদাত'-এর অনুবাদ ('সৌভাগ্য স্পর্শমণি')
২. মৌ. ছমিরুদ্দিন আহমদ সহযোগে 'মোহাম্মদীয় ধর্ম সোপান', ১৯০৩ (১ম বর্ষ 'নবনূর'-এ সমালোচিত)।

www.pathagar.com

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদি

ক. ইসলাম প্রচারক, ১৮৯৪-৯৫ :

(প্রথম দিকে 'এছলাম প্রচারক' নামে প্রচারিত। সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ)

১. এছলাম মিশন (সংখ্যা?), ১৮৯৫

খ. ইসলাম প্রচারক, নবপর্যায়, ১৮৯৯-১৯০৫ :

(সম্পাদক : মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ)

১. ইতিহাস ক্ষেত্রে মুসলমান (৫ম বর্ষ, ১ম-২য়-৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯০৩)
২. ইসলাম ও মিশন (৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম যুক্ত সংখ্যা, জুলাই-আগষ্ট, ১৯০৩)
৩. ইংরেজী ও আরবী শিক্ষার পরিণাম (৭ম বর্ষ ভাদ্র সংখ্যা/মে, ১৯০৫)
৪. নহরে জোবেদার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (৫ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০৩)
৫. প্যারিসে বিশ্ব প্রদর্শনী (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আগষ্ট, ১৮৯৯)
৬. বাণিজ্য ক্ষেত্রে আরব জাতি (৬ষ্ঠ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, মার্চ, ১৯০৫)
৭. মুসলমান শিক্ষার পূর্বতন নিদর্শন (৩য় বর্ষ ৯ম-১০ম সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯০০)

গ. প্রচারক, ১৯০০ :

(ছৈয়দ মোস্তফা জামাল-এর মতে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে মাসিক প্রচারকের একই সংখ্যায় ইসলামাবাদীর ৬টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। দ্র. ছৈয়দ মোস্তফা জামাল, ১৯৮০ : পৃ. ৯২, সম্পাদক : সুফী মধু মিয়া, অর্থাৎ মুনশী (ডাক্তার) ময়েজউদ্দীন আহমদ)।

১. ইসলাম ও বিজ্ঞান (২য় বর্ষ, ১৯০০)
২. তফসীর আজিজিয়ার বঙ্গানুবাদ (ঐ, ১৯০০)
৩. মযহাবের সভ্যতা (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭)
৪. লা-মযহাবিগণের ধর্ম রহস্যভেদ (মাঘ, ১৩০৬)
৫. স্পেনের ইতিহাস (২য় বর্ষ)
৬. হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী (২য় বর্ষ)

ঘ. মিহির ও সুধাকর, ১৯০২ :

(সম্পাদক : শেখ আবদুর রহিম)

www.pathagar.com

১. 'বাংলাদেশে প্রাদেশিক মোছলেম শিক্ষা সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা' অগ্রহায়ণ, ১৩০৯ (সূত্র : 'আদি ইতিহাস', ১৯৩১)

ঙ. নবনূর, ১৯০৫

১. ধর্ম ও বিজ্ঞান (৩য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩১২)

চ. বাসনা (কাকিনা, রংপুর) ১৩১৫ :

(সম্পাদক : শেখ ফজলল করিম)

১. খগোল শাস্ত্রে মুসলমান (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ও ২য় সংখ্যা)

ছ. 'আল এসলাম' (পরে ভাদ্র ১৩২৬ থেকে 'আল-এছলাম', ১৩২২-১৩২৭ : আঞ্জুমানে ওলামার তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত)।

১. অনুরোধ পত্র [৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা (এরপর থেকে ৫.৫ এইভাবে লেখা হবে), ভাদ্র ১৩২৬] মাওলানা আকরম খাঁর সহযোগে
২. অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য (৬.১০ মাঘ, ১৩২৭)
৩. অস্ত্র চিকিৎসায় মুসলমান (১.৪ শ্রাবণ, ১৩২২)
৪. আওরঙ্গজেব (২.৮ অগ্র+২.১১-১২ ফা-চৈ ১৩২৩; ৩.৩ আষাঢ়, ১৩২৪+৩.৫ ভাদ্র ১৩২৪; ৪.৯ পৌ. ১৩২৫)
৫. আঞ্জুমনে-ওলামা ও সমাজ-সংস্কার (৫.৩ আষাঢ়, ১৩২৬)
৬. আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতা (৫.১০ মাঘ, ১৩২৬)
৭. আরবী বিশ্ববিদ্যালয় (৬.৩ আষাঢ়, ১৩২৭)
৮. আলোচনা (৬.১ বৈশাখ, ১৩২৭)
৯. আসাম ভ্রমণ (৪.৬ আশ্বিন ১৩২৫-৫.১১ আষাঢ় ১৩২৭)
১০. ঈদুল-আজহা (৫.৫ ভাদ্র, ১৩২৬)
১১. ঈমানের তেজ (৫.১২ চৈত্র ১৩২৬-৬.৩ আষাঢ় ১৩২৭)
১২. ঈদের জমাআত– ধর্মের ব্যবস্থা (৫.৪ শ্রাবণ, ১৩২৬)
১৩. এছলামাবাদ জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় (৬.৯ পৌষ, ১৩২৭)
১৪. এসলাম প্রচার (১.১ বৈশাখ-১.৩ শ্রাবণ, ১৩২২)
১৫. কোরআনই উন্নতির সোপান (১.৯ পৌষ, ১৩২২)
১৬. কোরআন ও বিজ্ঞান (২.৫ ভাদ্র ১৩২৩-২.৭ সংখ্যা ১৩২৩)
১৭. কোরআনের আদর্শ (১.৬ আশ্বিন, ১৩২২)
১৮. কোরবানীর বিধান (৬.৩ আষাঢ়, ১৩২৭)

www.pathagar.com

১৯. [কৈফিয়ৎ] : (৬.৩ আষাঢ়, ১৩২৭)
২০. খেলাফত (৬.১ বৈশাখ, ১৩২৭)
২১. জাতীয় শিক্ষা (৬.৫ ভাদ্র+৬.৬ আশ্বিন; ১৩২৭)
২২. বঙ্গীয় মুসলমান ও উর্দু সমস্যা (৩.৬ আশ্বিন, ১৩২৪)
২৩. মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার (১.৬ আশ্বিন, ১৩২৭)
২৪. মোছলমান নিম্ন শিক্ষার উন্নতিবিধানের প্রস্তাব (৬.৬ আশ্বিন, ১৩২৭)
২৫. মোসলেম-বীরাঙ্গনা (১.৬ আশ্বিন ১৩২২-১.১১ ফাল্গুন ১৩২২; ৩.৪ শ্রাবণ ১৩২৪ + ৩.৫ ভাদ্র, ১৩২৪ + ৩.৯ পৌষ, + ৩.১০ মাঘ, ১৩২৪)
২৬. রোজা (৬.২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭)
২৭. শাহ ওলিওয়াল্লাহ্ সাহেবের অন্তিম উপদেশ (৩.৯ পৌষ, ১৩২৪), অনুবাদ।
২৮. শিল্পক্ষেত্রে মুসলমান (১.৩ আষাঢ় ১৩২২-১.৭ কার্তিক ১৩২২)
২৯. সমাজ-সংস্কার (৪.১০ মাঘ ১৩২৫-৫.৯ পৌষ, ১৩২৬)
৩০. বিবিধ প্রসঙ্গ, সম্পাদকীয় প্রভৃতি

জ. তবলীগ, ১৩৩৪

১. তবলীগুল এছলাম (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ)
২. ধর্মের আবশ্যকতা কি (১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ভাদ্র)

ঝ. মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৩৪

১. এসলাম ও শাসন অধিকার (কার্তিক ১৩৩৪-পৌষ ১৩৩৪ সংখ্যা)

এছাড়া 'মাহে নও' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনাও মুদ্রিত হয়।

www.pathagar.com

রচনার নমুনা

'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান' থেকে–

সূচনা

যে শাস্ত্র অধ্যয়নে পৃথিবীর আকৃতি, ধর্ম, বিভাগ, গতি ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায় তাহার নাম ভূগোল শাস্ত্র। ভূগোল পাঠ করিলে ভূপৃষ্ঠের জল ও স্থল বিভাগের প্রাকৃতিক অবস্থা এবং জীবজন্তু, উদ্ভিদ, উৎপন্ন সামগ্রী ও শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে সম্যকরূপে জ্ঞান লাভ করা যায়। যে ইতিহাস শাস্ত্রের প্রতি জগতের যাবতীয় অতীত কাহিনী, পৃথিবীর বিবিধ জাতির উত্থান-পতনের কারণ, জগতের রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির সবিশেষ বিবরণ অবগত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, যে শাস্ত্র চর্চ্চা মানবজাতির ভবিষ্যৎ জ্ঞান লাভ ও অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রধান সহায় সেই ইতিহাসের সহিত ভূগোল শাস্ত্রের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিজড়িত। ভূগোল, ইতিহাসের প্রথমভাগ বা উপক্রমণিকা স্বরূপ। ভূগোল বিদ্যা অভাবে ইতিহাস পাঠে কোন ফল লাভ করা যায় না। ভূপ্রদক্ষিণ, দেশ পরিভ্রমণ, প্রবাসযাত্রা ও বাণিজ্য-ব্যবসায় রেল বিস্তার এবং সমুদ্র পথে বাষ্পযান পরিচালন ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই ভূগোল শাস্ত্রের সাহায্য সাপেক্ষ। ভূগোল শাস্ত্রের সাহায্য অভাবে সমস্তই নিষ্ফল ও শৃঙ্খলা পরিশূন্য। যুদ্ধবিগ্রহ, দেশ বিজয়, রণক্ষেত্রে সৈন্য সঞ্চালন, ঘোর অরণ্য ও ভয়ঙ্কর বিপদসঙ্কুল পার্বত্য প্রদেশ ও জনমানব পরিশূন্য শ্মশান মরু প্রান্তর ভেদ করিয়া গন্তব্যস্থানে গমনাগমন ইত্যাদি সমস্তই ভূগোল শাস্ত্রের অলঙ্কার স্বরূপ মানচিত্রের প্রতি নির্ভর করে। এতদ্ব্যতীত ধর্মজগতের সহিতও ভূগোল শাস্ত্রের একটা আধ্যাত্মিক নৈকট্য সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। জগৎ স্রষ্টা বিশ্বনিয়ন্তা খোদাতায়ালার প্রতি অটল বিশ্বাস, তাঁহার উপাসনা এবং তাঁহার

www.pathagar.com

প্রতি আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা পরিপোষণ, তৎসকাশে অকৃত্রিম কাতরতা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ইত্যাদি কর্ত্তব্য কার্যই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য বা একমাত্র ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মনীতি প্রতিপালনের প্রতি মানবের মানসিক প্রবৃত্তি আকর্ষিত হওয়ার জন্য বিশ্বকর্ম্মা সর্ব্বশক্তিমান খোদাতায়ালার অপূর্ব্ব কার্য্য কৌশলতা, আশ্চর্য্য শিল্পচাতুর্য্য, তাঁহার বিশ্বজগতের অচিন্তনীয় মানব সাধ্যাতীত রচনা প্রণালীর নিগূঢ় তত্ত্বাবগত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। বলাবাহুল্য যে, সৃষ্টিকর্ত্তার ঐ সকল অভিনব রচনা কৌশল ও আশ্চর্য্য রহস্য ভেদ করার প্রধান সহায় ভূগোল শাস্ত্র; অতএব দেখা যাইতেছে, ধর্ম্ম জগতের সহিতও ভূগোল শাস্ত্রের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রকৃত ধার্ম্মিক হওয়ার জন্য ভৌগোলিক হওয়া নেহাত দরকার। যাহার পদতলে লুণ্ঠিত হইব, যাহার উপাসনা করিয়া শান্তি লাভ ও জীবনকে সার্থক করিব, তাঁহার অতুলনীয় গুণগরিমার ও অসাধারণ ক্ষমতা বাহুল্যের পরিচয় না পাইলে কিছুতেই অন্তরে অকৃত্রিম ভক্তি ও সরল বিশ্বাসের উদ্রেক হইতে পারে না। তাই বলিয়াছি, ভূগোল শাস্ত্রের সহিত রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি ও শিল্পবাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।"

'কনষ্টাণ্টিনোপল' থেকে–

ভূমিকা

মহামান্য তুরস্কের সোলতান আমিরুল মোমেনিন ও খলিফাতুল্ মোসলেমিন এবং খাদেমুল্ হেরামায়নশ শরিফাইন বলিয়া যেরূপ ইসলাম জগতে পরম সম্মানিত ও অতুল মহিমা গৌরবে ভূষিত, তদ্রূপ সেই প্রবল প্রতাপান্বিত সোল্তানে আজমের রাজধানী প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলাভূমি, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিক বৈচিত্র্যের রম্যক্ষেত্র মহানগরী কনষ্টাণ্টিনোপলও মুসলমানগণের নিকট সবিশেষ গৌরব সমন্বিত পরম আদরের বস্তু বলিয়া পরিগণিত।

ধর্ম্মনীতির চক্ষে ইসলাম জগতে পবিত্রভূমি মক্কা মোআজ্জমা ও মদিনা মুনাওয়ারা এবং বয়তুল্ মোকদ্দসের যে পদমর্য্যাদা সামাজিক হিসাবে এবং ইসলামিক রাজনীতিক দৃষ্টিতে কনষ্টাণ্টিনোপল মহানগরীও মুসলমানগণের নিকট তদ্রূপ গুরুত্বসম্পন্ন ও সম্মানার্হ। কনষ্টাণ্টিনোপল বা স্তাম্বুল বর্তমান

www.pathagar.com

সময় মুসলমানগণের একমাত্র জাতীয় গৌরবের কেন্দ্রভূমি এবং ইসলাম জগতের আশা-ভরসার পুণ্যক্ষেত্র, তুরস্ক সাম্রাজ্যের রাজধানী বীরভূমি কনষ্টাণ্টিনোপলের বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য মুসলমান মাত্রই যে কৌতূহলাক্রান্ত তাহা বলাই বাহুল্য।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি মুসলমানগণের সেই অপ্রহাতিশয্য ও কৌতূহল প্রাবল্য নিবৃত্তির অনুকূলে কিঞ্চিৎ সহায়তা করিবে মনে করিয়া তৎপ্রকাশে প্রয়াসী হইলাম। এই পুস্তক পাঠে যদি একজন পাঠকের অন্তরেও জাতীয় ভাবের উদ্রেক হয়, একটি হৃদয়তন্ত্রীও যদি স্বজাতি বাৎসল্যের গৌরব তানে বাজিয়া উঠে, তাহা হইলেও আমার পরিশ্রম সফল হইয়াছে মনে করিব। পুস্তকখানির আকার বৃদ্ধির যথেষ্ট উপকরণ এবং আলোচ্য স্থানসমূহের ফটো ও চিত্রাদি প্রদানের বিশেষ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের হতাদর ও দুর্দ্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া প্রথম উদ্যমে তাদৃশ ব্যয় বাহুল্যের গুরুভার বহনে সাহসী হইতে পারি নাই। খোদাতায়ালা যদি কখনও এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সুযোগ দান করেন তাহা হইলে আশা করি সে সকল অভাব পূরণ পূর্ব্বক প্রাণের আবেগ ও অভিলাষানুযায়ী সচিত্র বৃহৎ আকারের উৎকৃষ্ট ছাপা "কনষ্টাণ্টিনোপল" সমাজের করকমলে উপহারস্বরূপ উপস্থিত করিতে সমর্থ হইব।

এই পুস্তকের ১ম ও ৩য় অধ্যায়ের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মৎকর্তৃক সম্পাদিত "সোলতান" নামক সাপ্তাহিক বাঙ্গালা সংবাদপত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। শেষ অধ্যায় সম্প্রতি বর্ধিত করা হইয়াছে।

এই পুস্তক প্রকাশে আমার সহৃদয় বন্ধু মুনশী নেজাম উদ্দীনআহমদ সাহেব আমাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত ও সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। খোদাতায়ালা তাঁহার ও সমুদয় মুসলমান ভাই-বন্ধুগণের মঙ্গল বিধান করুন। (গ্রন্থকার)

www.pathagar.com

আরও কয়েকজন সমাজ-বিপ্লবী সমসাময়িক লেখক

মাওলানা মনিরুজ্জামান ছিলেন একজন সমাজ বিপ্লবী সফল কলম যোদ্ধা।

সমাজের কুসংস্কার আর অন্ধকারকে দূর করার জন্যে তিনি হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাঁর ক্ষুরধার কলম।

তিনি লিখেছেন অবিরাম। সাহিত্য-খ্যাতির জন্যে নয়, মানুষের কল্যাণের জন্যে তিনি সর্বদা লিখে গেছেন।

মনিরুজ্জামান চেয়েছিলেন, এ দেশের মুসলমানরা শিল্প-সাহিত্য-সাংবাদিকতাসহ গণমাধ্যমের সকল ক্ষেত্রে তাদের ঐতিহ্য এবং গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করবে।

সেদিনের সেই প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যধারার একটি নগজাগরণ ঘটেছিল। এবং সেটাই ছিল আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিপ্লব। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নতুন ধারা সৃষ্টির জন্যে সেদিন মাওলানা মনিরুজ্জামান ছাড়া আরও যারা লিখেছিলেন– তাঁরাও ছিলেন একেকজন খ্যাতিমান লেখক। স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাঁরাও সাফল্যে প্রোজ্জ্বল।

তাদের ভেতর অন্যতম মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), মৌলভী মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন (১৮৩২-১৯১৬), মহাকবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), দাদ আলী (১৮৫২-১৯৬৩), শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১), রিয়াজুদ্দীন মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মুনশী মুহম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), ডাক্তার আবুল হোসেন (১৮৬০-১৯১৯), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩), ও সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) প্রমুখ কবি সাহিত্যিক।

www.pathagar.com

আরবী ও উর্দু পত্রিকার লেখক

আগেই বলেছি, মাওলানা মনিরুজ্জামান প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বাংলা ভাষা না শিখেও নিজের প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রমের ফলে বাংলা ভাষায় একজন দক্ষ সাংবাদিক, সম্পাদক ও লেখক হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

তিনি বাংলা ভাষায় যেমন লিখতেন, তেমনি লিখতেন আরবী ও উর্দু ভাষাতেও।

সে সময় সুদূর মিসর থেকে প্রকাশিত হতো 'আল মানার' ও 'আল হামরা' নামে আরবী ভাষায় দু'টি বিখ্যাত পত্রিকা।

মাওলানা মনিরুজ্জামান এ দু'টি পত্রিকায় আরবী ভাষায় নিয়মিত লিখতেন।

খিলাফত আন্দোলনকে জোরদার করার জন্যে মাওলানা আকরম খাঁর সম্পাদনায় ১৯২০ সালে প্রকাশিত হলো একটি উর্দু দৈনিক পত্রিকা। পত্রিকাটির নাম 'যামানা'।

এই উর্দু দৈনিকে মাওলানা মনিরুজ্জামান বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিয়মিত লিখতেন।

তাঁর সাথে আরও লিখতেন সেই সময়ের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও লেখক- মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা যফর আলী, মাওলানা আযাদ, মাওলানা হাসরত মুহানী, মাওলানা আযাদ সোবহানী, মাওলানা আবদুল্লাহ বাকী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদগণ।

www.pathagar.com

ভাষণ-অভিভাষণ

লেখা ছাড়াও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী কবি ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর মতো ছিলেন এক অসাধারণ বাগ্মী। তিনি গ্রাম থেকে গ্রামে, এক জেলা থেকে অন্য জেলা– এভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতা করে বেড়াতেন।

তাঁর বুকে যে বারুদ স্ফুলিঙ্গ ছিলো, তিনি সেই বারুদ স্ফুলিঙ্গে সাধারণ মানুষকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে ঘুমন্ত ও নিষ্প্রাণ মুসলমানের বুকে বয়ে যেত জেগে ওঠার এক মহা প্রলয়ঙ্করী ঝড়।

ইসলামকে প্রাণের চেয়ে ভালোবেসেই মনিরুজ্জামান মুসলমানকে জাগাবার দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন।

মাওলানা মনিরুজ্জামানের বক্তৃতা শোনার জন্যে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক ছুটে আসতো। তারা গভীর আগ্রহের সাথে শুনতো মাওলানার কথা। মাওলানাও ছিলেন তাদের হৃদয়ের মানুষ। অত্যন্ত আপনজন।

মাওলানা যখন যেখানেই বক্তৃতা দিতেন, তিনি খেয়াল রাখতেন সাধারণ মানুষের কথা। নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের মাঝে তিনি নিজেকে বিলিয়ে দিতেন সকল সময়।

শুধু কথায় নয়, কাজের মধ্য দিয়েও মাওলানা মনিরুজ্জামান সাধারণ মানুষের হৃদয়কে জয় করতে পেরেছিলেন। মনিরুজ্জামানের ভাষণ-অভিভাষণের দিকে তাকালে তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর চিন্তা ও দর্শনে আমরা বিস্মিত হই। কী অসাধারণ ছিল তাঁর সেই চিন্তার গভীরতা। এইসব ভাষণ-অভিভাষণ কেবল তৎকালীন সময়ের জন্য যে কেবল গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই নয়, আজকের জন্যেও সমান মূল্যবান। এর সাহিত্যমূল্যও রয়ে গেছে অনেক বেশি। এখানে তাঁর সেইরকম কয়েকটি ভাষণ-অভিভাষণের সাথে আমরা পরিচিত হবো।

www.pathagar.com

কয়েকটি অভিভাষণের নমুনা

মাতৃভাষা

"মাতৃক্রোড়ে থাকিতেই শিশু আধআধ-স্বরে স্বভাবের প্রেরণার মুখে যে কথা ব্যক্ত করে, তাহাই মানুষের মাতৃভাষা। এই হিসাবে বাংলা বাঙ্গালার পৌণে-ষোল-আনা লোকের মাতৃভাষা। ইহাতে হিন্দু মুসলমানের কোন পার্থক্য নাই। ঢাকা, কলিকাতা, মোর্শেদাবাদ ও চট্টগ্রাম টাউনের মুসলমানের মাতৃভাষা বিকৃত উর্দ্দু ও বাংলায় মিশ্রিত হইয়া গেলেও তাহারা উভয় ভাষাতেই মনোভাব প্রকাশ করিতে অভ্যস্ত বরং তাহাদের সংসার-জীবনের প্রত্যেক স্তরেই তাহারা উর্দ্দু অপেক্ষা বাংলার অধিকতর মুখাপেক্ষী। খাতা-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও পত্র-ব্যবহার সমস্তই তাহাদিগকে বাংলাতেই করিতে হয়। সুতরাং বাংলা যে তাহাদেরও মাতৃভাষা, ইহাতে দ্বিমত হইতে পারে না।"

মাতৃভাষার উন্নতি

"মাতৃভাষার উৎকর্ষ সাধন ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে পারে না ইহা অবিসম্বাদিত সত্য। সভ্য-জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রমাণিত হয়, জগতে এমন কোন জাতির দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আরব জাতি বিজয়ীবেশে পারস্যে প্রবেশ করিয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছে সত্য, পারস্য-সাহিত্যে তাহারা আরবী-প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাও সত্য, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তদ্দেশীয় মাতৃভাষার পরিবর্ত্তে সেখানে তাঁহারা আরবী-সাহিত্য প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন নাই। বরং মোছলমান আমলে পার্শী-সাহিত্যের যে অসাধারণ উন্নতি হইয়াছিল, অতীত ইতিহাসে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তুর্কীরা আরব দেশে আসিয়া ইসলামের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল, আরবী ধর্ম্ম ও আরবী সাহিত্য তাহাদের হৃদয়ে ও মস্তিষ্কে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু তাই বলিয়া তুর্কীদের মাতৃভাষা তুর্কী মুছিয়া যায় নাই। বরং তুর্কীরা বিগত ৬ শত বৎসর ব্যাপিয়া নিজেদের মাতৃভাষা তুর্কীর সাহায্যেই তিনটা মহাদেশ জুড়িয়া রাজ্য শাসন করিতে সমর্থ

www.pathagar.com

হইয়াছেন। ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত আরও উজ্জ্বল। আরব আমল হইতে মোগল পাঠান মোছলমান শাসনবর্গের আমলদারীর প্রায় হাজার বৎসর কাল শাসক সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা ছিল আরবী, তুর্কী ও পার্শী, কিন্তু তাহাদের সেই ভাষা ও ভাষার প্রভাব ভারতের প্রাদেশিক বা মাতৃভাষার স্থান অধিকার করিতে পারে নাই। ভারতের হিন্দি, গুরুমুখী, গুজরাটি, তেলেঙ্গী, বাঙ্গালা, আসামী ও উড়িয়া ভাষা প্রভৃতি আজও এদেশে অক্ষুণ্ন আছে। ইংরেজ আমলেও সেই অবস্থা বিদ্যমান, রাজভাষা ইংরেজী প্রাদেশিক ভাষার প্রভাব নষ্ট করিতে পারে নাই।

রাজভাষা ও মাতৃভাষা অভিন্ন হইলে দেশের ও জাতির উন্নতির পথ যেরূপ সুগম হয়, বিভিন্নাবস্থায় সেরূপ হইতে পারে না। আরবেরা আরব দেশে, তুর্কীরা তুরস্কে, পার্শীরা পারস্যে যেরূপ রাজভাষা ও মাতৃভাষাকে অভিন্ন রূপে লাভ করিয়া জাতীয় উন্নতি ও অভ্যুত্থানের পথ সুগম করার সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেরূপ সৌভাগ্য মুসলিম জগতের অন্যত্র ঘটে নাই। বাঙ্গলার মোছলমান সংখ্যা প্রায় তিন কোটি, এত অধিক মোছলমান তুরস্কে, আরবে, পারস্যে ও মিসর প্রভৃতি একা কোন মোছলমান রাজ্যেই নাই। ভারতের অন্য কোন প্রদেশেও এত মোছলমানের বাস নাই, কিন্তু বাঙ্গালার মোছলমান যেরূপ উন্নতির সকল স্তরে অতি নিম্নে নিপতিত, এরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। শিক্ষায়, জ্ঞান চর্চ্চায়, অধিকারের বেলায় আমরা সর্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ। যুক্ত প্রদেশে শতকরা ১৫ জন মাত্র মোছলমান, কিন্তু সেখানে মোছলমানগণের জাতীয় গৌরবের অনেক নিদর্শন বিরাজমান আছে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ ও দেওবন্দের আরবী বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। মোছলমানের প্রেস, পুস্তকালয়, পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা এবং দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে শতকরা ৮৫ জন অমোছলমানের তুলনায় তাহাদেরই প্রাধান্য লক্ষিত হয়। রাজকর্ম, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ও ব্যবস্থাপক সভাতেও তাঁহারা শতকরা ৩৩টি স্থান অধিকার করিয়া আছেন। পাঞ্জাবের মোছলমানগণ সংখ্যায় কম নহে, বরং কিঞ্চিৎ অধিক। তাঁহারা শিক্ষা ক্ষেত্রে কলেজ এবং জাতীয় জীবনের প্রধান সম্বল প্রেস স্থাপন ও সংবাদ পত্র প্রচারে প্রতিবেশীদিগকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।"

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের পূর্বকথা

"বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, তাহার উৎপত্তির ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক ইতিহাস, নূতন পুরাতন কাব্য এবং পদ্য ও গদ্য সাহিত্যের সমালোচনা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও হিন্দু মোছলেম লেখকগণ কর্ত্তৃক এত অধিক পরিমাণে হইয়া গিয়াছে যে, আমার এই এক নিশ্বাসের ক্ষুদ্র অভিভাষণে তাহাকে বিশেষ স্থান দেওয়া সমীচীন মনে করিতেছি না। ইসলামাবাদের সাহিত্য গৌরব মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এবং অদ্যকার মিলনক্ষেত্র বশিরহাট এলাকার গৌরব কেতু, বহু ভাষা বিশারদ পণ্ডিত, বাংলা সাহিত্যের যশস্বী নায়ক, মৌলভী শহিদুল্লা এম. এ. বি. এল. ও এই অঞ্চলের অন্যতম প্রবীণ সাহিত্যিক ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকী, পাংশার জ্বলন্ত উৎসাহী প্রবীণ সাহিত্যিক মৌলভী রওশন আলী চৌধুরী এবং হিন্দু সাহিত্যিকগণের মধ্যে বাবু দীনেশচন্দ্র সেন, বাবু শশাঙ্ক মোহন সেন বিশেষতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট না হইলেও অত্যন্ত মূল্যবান। এই অধমের বিবেচনায় তাহার অতিরিক্ত অন্য কেহ কিছু দেখাইতে পারুক আর নাই পারুক, ঐ সকল বিবরণ যে স্বাধীন সমালোচনা সাপেক্ষ এবং তাঁহাদের অনেক উক্তি যে তীব্র প্রতিবাদ যোগ্য, তাহাতে সংশয় নাই। কিন্তু স্থান ও সময়াভাবে আমি বাংলা সাহিত্যের পূর্ব্ব কাহিনীর বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলাম না। তবে নিতান্ত পক্ষে যে ২/৪টি কথা না বলিলে চলে না, তাহাই এখানে বলিতেছি..."

বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি

"ইহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, বৌদ্ধ আমলে এতদ্দেশে প্রাকৃত ও পালি ভাষার প্রচলন ছিল। সে সময় সংস্কৃত ভাষার আদর ও চর্চ্চা যথেষ্ট পরিমাণে খর্ব্ব হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং তাঁহার উপদেশ রত্নাবলী যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত না হয়– তজ্জন্য তাঁহার শিষ্যদিগকে কঠোরভাবে আদেশ দিয়াছিলেন। তাই তাহা পালিতে লিখিত হয়। এদেশে বৌদ্ধ-প্রভাব লুপ্ত হওয়ার পর অষ্টম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত হিন্দু আমলে আবার সংস্কৃত ভাষার সমাদর হয়। তখন প্রাকৃত ভাষা হইতে এক নূতন ভাষা সৃষ্টির সূত্রপাত হইতে পারে। সেই ভাষাকে বাঙ্গালা ভাষা নামে আখ্যায়িত করার তখনও কোন হেতু উপস্থিত হইয়াছিল না। অবশ্য পরবর্তী

www.pathagar.com

যুগের নানা পরিবর্ত্তনের পর উহাই বাঙ্গালা ভাষা নামে অভিহিত হইয়াছে। সেই যুগে কেহ কেহ প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার সংস্কৃত ধর্ম্ম গ্রন্থের অনুবাদ করতে চাহিলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ তাহার কঠোর প্রতিবাদ করিতেন। কাহাকেও অন্য কোন ভাষার আশ্রয় লইতে দেখিলে তাঁহারা এরূপ কার্য ধর্ম্ম বিগর্হিত বলিয়া তাহাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইতেন। রাজ সরকারের প্রতি প্রভাব বিস্তার করিয়া নূতন ভাষায় অনুবাদ-প্রিয় লেখকদিগকে দণ্ডিত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই কারণে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রভাব লুপ্ত হওয়ার পরও মুসলমান আমলের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা মাথা উঁচু করিয়া উঠিতে পারে নাই। এই নূতন ভাষা সৃষ্টির পথে হিন্দু আমলের গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অন্তরায় উপস্থিত না হইলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগ অন্ততঃ ৪/৫ শত বৎসর অগ্রসর হইয়া যাইত। হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষণশীলতা ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের স্থিতিস্থাপকতার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যকাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ বা বঙ্গে মোছলমান আমলের অভ্যুদয় পর্যন্ত স্থগিত থাকে।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবধারা

"এই ত গেল ভাষা ও শব্দ সম্পদের কথা। ভাবধারার দিক দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের গতিপথ নির্দ্ধারণ করা, তাহাও একান্ত আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষায় আজকাল রাশি রাশি পুস্তক প্রচারিত হইতেছে। ইহা আমাদের পক্ষে আনন্দের কারণ বা নিরানন্দের হেতু এবং তাহা লাভজনক বা অনিষ্টকর, তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে। রাশি রাশি বাঙ্গালা সাহিত্য পুস্তকের মধ্যে জনহিতকর পুস্তক ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সংখ্যা এত কম এবং ঈদৃশ সমাজ ও দেশহিতকর রচনাবলীর প্রতি পাঠকবর্গের রুচি ও আগ্রহ এত অকিঞ্চিৎকর যে, তদ্দর্শনে প্রাণে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তক হইল নভেল, নাটক ও গল্প-প্রহসন ইত্যাদি। আবার পাঠকবর্গের মধ্যে এই শ্রেণীর পুস্তকের পাঠকই পৌণে ষোল-আনা। ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক বা ধর্ম্ম সংক্রান্ত এবং শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক পুস্তকের সংখ্যা একে অতি কম, আবার সেরূপ পুস্তকের পাঠক ও গ্রাহকের সংখ্যা আরও নগণ্য। এই সকল হইল আমাদের অধঃপতন ও ধ্বংসের কারণ।

www.pathagar.com

আজকাল তথাকথিত সুগন্ধিজাত কেশ তৈল, পানের মসলা, চুরুট, সিগারেট ও মুখে মাখার নানা প্রকার পাউডার, স্নো, পমেটম ইত্যাদি অকেজো বিলাস দ্রব্য যেমন সংক্রামক রোগের ন্যায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে, গল্প, উপন্যাস এবং নাটকের বই-পুস্তক ও মাসিক পত্রেও সেরূপ দেশ ভাসিয়াই চলিয়াছে। অধিকাংশ বিলাস তৈল যেমন রিফাইন কেরোসিন হইতে প্রস্তুত বিধায় তদ্বারা শেষে কেশের দফারফা হইয়া যায়, অনেকেই এই বাজারী কেশ তৈল ব্যবহার করিয়া অকালে মস্তকের কেশের সঙ্গে মস্তিষ্কটুকুও হারাইতে বসিয়াছে– সাহিত্যক্ষেত্রে যুবক-যুবতী উপন্যাসের কুৎসিত ভাবপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিয়া, নীতি-বিগর্হিত নগ্ন ছবি ও আপত্তিকর অশ্লীল নাটকের অভিনয় দেখিয়া চরিত্র-বল হারাইতে ও ধর্ম্ম বিশ্বাসে জলাঞ্জলী দিতে বাধ্য হইতেছে। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, ঐতিহাসিক, দার্শনিক এবং জনহিতকর পুস্তকাদি আলোচনার লোক দেশে বিরল। ঐ শ্রেণীর পুস্তক কীটদ্রষ্টাবস্থায় 'তাকে' ও আলমারীতে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, সেই সকল পুস্তকের ক্রেতা ও পাঠক দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আজকাল গল্প পুস্তকে, উপন্যাসে, গ্রন্থে ও মাসিক পত্রে যত অধিক "প্যারিস-পিকচারের" ছায়া বা আদর্শ চিত্রিত হইবে, ততই তাহার কাটতি ও আদর। মোছলমান-সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই শ্রেণীর একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেছি। ইংরাজীর ভাষায় মিষ্টার ছৈয়দ আমীর আলীর History of the Saracens অর্থাৎ "আরব জাতির ইতিহাস" পুস্তকখানির গুরুত্ব ও মূল্য কত, তাহা সাহিত্যসমাজ অবগত আছেন। এই পুস্তক দ্বারা তিনি সমগ্র জগতের সাহিত্য সমাজে পরিচিত ও সম্মানিত। এই পুস্তকখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন রংপুরের স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক মৌলবী রেয়াজউদ্দীন আহমদ। তিনি বহুকষ্টে ধার-কর্জ্জ করিয়া বহিখানি প্রকাশ করেন। আমার মতে এই পুস্তকখানি মোছলিম বাঙ্গালা সাহিত্যের অতি মূল্যবান সম্পত্তি, কিন্তু পাঠক ও গ্রাহকের অভাবে পনর বিশ বৎসর গড়াগড়ির পর অনুবাদক তাঁহার বহু পরিশ্রমলব্ধ তিন খণ্ড পুস্তক ও পুস্তকের স্বত্ব ১২৫ টাকা মাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া কোন প্রকার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। তিনি পুস্তকের জন্য যে সকল ব্লক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহার মূল্যটুকুও উসুল করিতে পারেন নাই। মির্জা ইউসুফ আলী মরহুমের "সৌভাগ্য স্পর্শমণি" কত মূল্যবান পুস্তক,

www.pathagar.com

তাহা সকলেই জানেন। বিগত ৩০ বৎসরের মধ্যে তাহার একাধিক সংস্করণ হইল না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? আর এইদিকে "বিষাদ সিন্ধু" "আনোয়ারা" প্রভৃতি ঔপন্যাসিক গ্রন্থের অবস্থা দেখুন, ঐ শ্রেণীর পুস্তকের ঘন ঘন সংস্করণ হইতেছে। বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দু সমাজের উপন্যাসের ছড়াছিড় অধিক। তাহাদের মাসিক পত্রসমূহ গল্প-উপন্যাসেরই বাহক। ঐ শ্রেণীর গ্রন্থকার ও পত্রিকার সম্পাদকগণ ব্যবসার খাতিরে লোকের রুচি এত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন যে উপন্যাসের প্লাবনে যুবক-যুবতীগণের চরিত্র বাঁধন দিন দিন এত শিথিল হইয়া পড়িতেছে যে, তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন সাহিত্যিক সমাজের পক্ষে মহাপাপ বলিয়া আমার ধারণা। স্বীকার করি, সাহিত্যের-উৎকর্ষ সাধনের জন্য গল্প-উপন্যাসের প্রয়োজন আছে এবং তাহা দুনিয়ার সকল দেশের সাহিত্যেই বিদ্যমান। কিন্তু সকল বস্তুর একটা সীমা আছে। প্রত্যেক বস্তুর সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেই তাহা মন্দ ও নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ ইউরোপ ও আমেরিকার দোহাই দিবেন, কিন্তু সেই উপমা এখানে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক ও অসঙ্গতা। গল্প-উপন্যাসের ছড়াছড়ি জাতির উন্নতির চরম দশার ফল ও পতনের পূর্ব্বলক্ষণ মাত্র। ইউরোপ উন্নতি-রাজ্যের বহু সোপন অতিক্রম করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও শিল্প-বাণিজ্যের সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করার পরেই বিলাসিতার পাপ-পঙ্কিলে নিপতিত হইয়াছে। আর ভারতবাসী "গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি।" জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতীয় উন্নতির দুই একটী সোপানে পদ-নিক্ষেপ করিতে না করিতেই বিলাসিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও পতনের তমোময় গহ্বরে নিপতিত হইতে চলিয়াছে; সুতরাং এই দোষ মার্জনীয় নহে।

পূর্ব্বালোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, মোছলমান আমলেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি, বাদশাহী শাসনকালেই বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধিত হয়। আসল কথা এই যে, এই বাঙ্গালা ভাষাই– বিগত ৮ শত বর্ষ হইতে এতদ্দেশীয় হিন্দু-মোছলমান উভয়ের মাতৃভাষা। হিন্দু অপেক্ষা মোছলমানরাই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি সাধনকল্পে এক সময় অধিকতর প্রয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এই সকল কারণে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি মোছলমানের দাবী-দাওয়া ও স্বত্বাধিকার হিন্দুর তুলনায় যে অধিক, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।"

www.pathagar.com

ইসলামের প্রতি ভালোবাসা

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী নিজের প্রাণের চেয়েও ভালোবাসতেন তাঁর দেশকে, মানুষকে এবং ইসলামকে। অর্থাৎ মুসলমানকে।

তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না। মুসলমানের ব্যথায় তিনি কাঁদতেন, তাঁদের সুখে তিনি হাসতেন। তিনি সর্বদা ভাবতেন কিসে তাদের কল্যাণ হবে, কিসে এই জাতি আবার সগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। ভাবতে ভাবতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। তাঁর বক্তৃতা, পত্র-পত্রিকা সম্পাদনা এবং লেখনীতে আমরা জাতির এই জাগ্রত বিবেকের আর্তচিৎকারের ধ্বনি শুনতে পাই।

১৯২৭ সালে প্রকাশিত 'ইসলামে ভ্রাতৃত্বভাব' শীর্ষক প্রবন্ধে মনিরুজ্জামান মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছেন :

"আমরা সংকীর্ণ নীতির পক্ষপাতী নই। কিন্তু মানুষ হিসাবেও দুর্বল ও বিপক্ষের সাহায্য করা কি কর্তব্য নহে? মুসলমান আজ যত্রতত্র হইতে কুকুর বেড়ালের ন্যায় বিতাড়িত হইতেছে অথচ মুসলমানগণের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মনির্ভরতার কোন আয়োজনই দেখা যায় না।... ইসলাম মুসলমানের অস্তিত্ব ভূ-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া ফেলিবার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন জাতি আদাজল খাইয়া লাগিয়াছে। তাহাদের জনবল, ধনবল, বুদ্ধিবল সবই অধিক; তাহারা ছলে বলে কৌশলে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করিতে লালায়িত। কিন্তু মুসলমানের সে ভাবনা নাই– তাহারা এখন ভূমির আইল... হানাফী-মোহাম্মাদী ঝগড়ার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত। এদিকে যে ইসলামের ভিত্তি উৎপাটিত হইতেছে, ভারতের ৮ কোটি ও বাংলার ৩ কোটি (তৎকালীন) মুসলমানের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িয়াছে সে ভাবনা নাই; মুসলমান আত্মবিস্মৃত হইয়া এখনো ঘরোয়া বিবাদে মত্ত।"

www.pathagar.com

'ভারতে মুসলমান স্থাপত্য' শীর্ষক রচনায় মাওলানা মনিরুজ্জামান মুসলমানের স্বর্ণোজ্জ্বল অতীত ইতিহাসের কাহিনী এভাবে তুলে ধরেন :

"মুসলমানগণ স্বীয় উন্নতি যুগে স্থাপত্যবিদ্যায় যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা কর্ডোভা, গ্রানাডা, দামেশক, সমরকন্দ, বোখারা, দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, গৌড় প্রভৃতি স্থানে স্থাপত্য কীর্তির যে সকল অলৌকিক নিদর্শন এবং অতুলনীয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন বর্তমানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির চরম যুগে ভূ-পৃষ্ঠে তাহার তুলনা দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকা সমৃদ্ধি, গৌরব, শিক্ষা, সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অতীতকালকে অনেকাংশে পশ্চাদপদ করিয়াছে সত্য কিন্তু স্থাপত্যবিদ্যায় এখনও পাশ্চাত্যজাতি মুসলমানগণের উন্নতির যুগের সমকক্ষতা লাভ করা দূরে থাকুক তাহার নিকটবর্তী হইতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহ।... স্পেনে মুসলমান আমলের কর্ডোভার জামে মসজিদ, বাগদাদের খলীফা হারুন-আল-রশীদ নির্মিত রাজপ্রাসাদ, দিল্লীর কুতুব মিনার, জামে মসজিদ, দরবারে আম, দরবারে খাস, মতি মসজিদ, এতেমাদদৌলার রওজা, সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি ভবন, ফতেহপুর সিক্রির প্রাসাদমালা, লক্ষ্ণৌস্থ আসদদ্দৌলার ইমাম বাড়ি, হোসেনাবাদের ইমাম বাড়ি, গৌড়ের সোনা মসজিদ ও দুর্গাভ্যান্তরস্থ প্রাসাদমালা ইত্যাদি স্থাপত্য কীর্তিমালার তুলনা জগতের স্থাপত্য শিল্পে নাই বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। ইউরোপীয় পর্যটকগণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, মুসলমানদের প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি রাশির তুলনা জগতে নাই।"

মুসলমানদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে এবং নানাভাবে মাওলানা মনিরুজ্জামান তাঁদেরকে জাগাবার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন সারাটা জীবন। ইসলাম ও মুসলমানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল সীমাহীন, ব্যাপক-বিশাল।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক জীবন

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন মানুষের অধিকারের ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সাধারণ মানুষের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে কষ্ট দিত, ভাবিয়ে তুলতো।

তিনি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তাদের জীবনের সুখ-শান্তি, স্বাধীনতা, আদর্শ ঐতিহ্য- তথা সার্বিক কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

রাজনৈতিক জীবনে ইসলামাবাদী ছিলেন একজন নির্ভীক সংগ্রামী পুরুষ।

তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। এটা তাঁর সংগ্রামী বর্ণাঢ্য জীবন থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান

ইংরেজ ছিল মুসলমানদের প্রকাশ্য দুশমন।

মুসলমানদেরকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কোন সীমা ছিল না। নানা ধরনের অপকৌশলে তারা মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরই শুরু হয় খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন।

এই আন্দোলন মাওলানা মনিরুজ্জামানের জীবনে বয়ে আনে এক নবচেতনার জোয়ার। মুহূর্তেই তিনি জেগে উঠলেন। সকল বাধা উপেক্ষা করে ক্রমাগত সামনে এগিয়ে চললেন।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলাম ও মুসলমানের নিশ্চিহ্নকারী এই চরম দুশমন ইংরেজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। মুসলিম ঐক্য ও সংহতি জোরদার করার জন্যে তিনি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ইস্পাত-কঠিন নেতা। মনিরুজ্জামানও তাঁদের সাথে এই আন্দোলনে যোগ দেন।

প্রকাশ্য রাজপথে আন্দোলন করা ছাড়াও তিনি এই সমস্যাকে সামনে রেখে সমানে লিখতে থাকেন। 'অসহযোগিতা ও আমাদের কর্তব্য' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

"এই অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য দুইটি– খিলাফত সমস্যার সমাধান। তুরস্ক সোলতানের হৃতরাজ্যসমূহের পুনরুদ্ধার, ইসলাম জগতের খলিফার পদমর্যাদা রক্ষা করা। দ্বিতীয়টি ভারতের স্বরাজ লাভ।... খিলাফত রক্ষা না হইলে... মুসলমান জাতির সর্বনাশ।"

..."সহযোগিতা বর্জন বিধির মধ্যে কয়েকটি বিষয় আছে : (ক) সরকারী উপাধি পরিত্যাগ করা, (খ) সরকারী অফিস আদালত ছাড়িয়া জাতীয় আদালত স্থাপন করা, (গ) সরকারী ও সরকার সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করা।"

মনিরুজ্জামানের এসব লেখায় সাধারণ পাঠকরাও অনুপ্রাণিত হতো। তারাও জেগে ওঠার সাহস সঞ্চয় করতো।

ইসলাম প্রচার ও সংস্কার কর্মের আবেগ ও অভিজ্ঞতা থেকেই ইসলামাবাদীর রাজনীতি-জীবনের শুরু। ১৩০৬ সাল থেকেই তিনি স্বদেশের মুসলমানদের, বিশেষত কৃষক-প্রজার দুর্দশা দূর করার জন্যে নানা পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি মুসলিম জাহানের আহ্বানে বলকান যুদ্ধের সময় ও খিলাফত আন্দোলনে রাজনীতিতে গভীরভাবে নিমগ্ন হন। পরিশেষে ভারতের মুক্তি আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জমিয়ত-ই-ওলামায়ে হিন্দে' যোগদান করেন। তিনি একসময় জাপানীদের সাথে সুভাষ বসুর সহযোগে ব্রিটিশ বিরোধী ষড়যন্ত্রে জড়িত হন বলেও অনেকে মনে করেন।

এই মনীষীর রাজনৈতিক চিন্তা কেমন ছিল এবং পরাধীনতার গ্লানি ও হতভাগ্য মুসলমানদের বর্তমান দুর্দশায় কিভাবে পীড়িত হতেন এবং এর

www.pathagar.com

ফলে তিনি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন– তা আজ নতুন করে ভাববার বিষয় বটে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংবাদিক তাঁর জীবনের এ দিকটি সম্পর্কে যেসব মন্তব্য করে গেছেন, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নিচে তারই কিছু অংশ তুলে ধরা হলো। এতে বুঝা যাবে, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা আসলেই মুসলিম সমাজের সামগ্রিক পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন ও ধ্যানে এবং স্বীয় বৈশিষ্ট্যে কতটা সু-উদ্ভাসিত ছিল।

মুহাম্মদ আবদুল হাই মন্তব্য করেন,

"তিনি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক কর্মী, সমাজ-সেবক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বক্তা। ১৯২০ সালে তিনি খিলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন...

অবিভক্ত ভারতে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দের' বাংলা শাখার তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

মনিরুজ্জামান ছিলেন প্যান-ইসলামবাদী। কি করলে মুসলিম জাতি আবার হৃত গৌরব ফিরে পাবে সে চিন্তাই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল।

তিনি কংগ্রেসের সভ্য হিসাবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণও করেছিলেন।... এবং কৃষকপ্রজা আন্দোলনের সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন।"

উল্লেখ্য, ইসলামাবাদী ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি আবার ১৯৩৭ সালে কৃষকপ্রজা পার্টির টিকেটে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন বলেন,

"তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও একজন উৎসাহী কর্মী হিসাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। তিনি আমরণ কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। তিনি অবিভক্ত বাংলায় কংগ্রেসের একজন সহকারী সভাপতি ছিলেন। তিনি কংগ্রেসকর্মী হিসাবে অনগ্রসর মুসলমান সমাজের নিকট বহু লাঞ্ছিত হন। কংগ্রেসকর্মী হিসাবে তাহাকে কারাবরণ করিতে হয়। তিনি তাহাতেও দমিত হন নাই। পরন্তু কারামুক্তির পর অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করিয়া যাইতে থাকেন...

www.pathagar.com

তিনি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং সমগ্র পাক-ভারতে তীব্রভাবে আন্দোলন চালাইতে থাকেন...

তিনি ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কৃষকের উন্নতি ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নহে এবং বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকই মুসলমান। সুতরাং তিনি কৃষকপ্রজা কর্মী হিসাবে বহু কাজ করেন।"

আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৭ অক্টোবর, ১৯৫০) তাঁর মৃত্যুতে নিম্নোক্ত যে সংবাদ পরিবেশিত হয়, তাতে তাঁর রাজনীতি জীবনের আরও কিছু তথ্য জানা যায়। সংবাদটি প্রকাশিত হয় এইভাবে :

"মৌওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী/চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতার পরলোকগমন/(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)/চট্টগ্রাম ২৬শে অক্টোবর : দীর্ঘদিন রোগে ভুগিবার পর চট্টগ্রামের বিশিষ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতা মৌওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী মঙ্গলবার তাঁহার পল্লীগ্রামস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের অন্তরঙ্গ সহকর্মীরূপে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালে তিনি গান্ধীজি প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি গান্ধীজির নীতি ও আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।..."

ড. আবদুল গফুর সিদ্দিকী তাঁর 'সাংবাদিক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী' প্রবন্ধে ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনের বিচ্ছিন্ন কয়েকটি তথ্য পরিবেশন করেন। তথ্য হিসাবে সেগুলির গুরুত্বও কম নয়। এর কিছু অংশ তুলে ধরছি :

"মাওলানা ইসলামাবাদী যখন প্রথম রাজনৈতিক আসরে নামিয়াছিলেন, তখন সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন মৃতপ্রায়। মাওলানা মিরাযউদ্দিন ও পণ্ডিত মাশহাদী তখন কৃষক আন্দোলনকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। মনিরুজ্জামান এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। মিহির ও সুধাকরে এই আন্দোলনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইত 'ঘুড়ির সূতা' নামে। কোন হিন্দু পত্রিকাই এই আন্দোলনের কথা ছাপাইত না। তাহারা বলিত– 'কৃষক আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়া উঠিলে জমিদার, গাঁতীদার ও দর-গাঁতীদারদিগের ক্ষতি হইবে'।...

www.pathagar.com

এই সময়... ছোলতান অফিস উঠাইয়া আনা হয় কোরিস চার্চ লেনের একটি বাড়ীতে। এই সময় লর্ড কর্জ্জনী বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ হয়। মনিরুজ্জামান এই আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন।

কিন্তু চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার মুসলমানেরা মুনশী শেখ আখতার হোসেনের নেতৃত্বে যখন স্বজাতি আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন মনিরুজ্জামান ইহাতেও অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কোন উপায় অবলম্বন করিলে সিলহট কাছাড়া ও পূর্ণিয়া জেলাকে বাঙলার অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে, এই স্বপ্নে দিনরাত্রি তিনি বিভোর ছিলেন।

মীর্জাপুর পলিটিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনের গঠনকারীদিগের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।"

সৈয়দ আলী আযমের কয়েকটি অভিমত ছিল এই রকম :

"এই বিপ্লবী নেতার পশ্চাতে সি.আই.ডি.গণ সর্বদাই লাগিয়া থাকিত। বিগত ১৯৪৫ ইংরেজীতে ভারত গভর্নমেন্টের আদেশে তাঁহাকে বার্ধক্যে লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী করিয়া রাখা হয়। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর তথা জাপানীদের চর হিসাবে কার্য করিতেছেন। যিনি বৃটিশ-ভারতের সিংহাসন উল্টাইবার জন্য বদ্ধপরিকর, যিনি জাপানীদের সহযোগিতায় বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটাইতে ইচ্ছুক– এতাদৃশ একজন তীক্ষ্ণধী পুরুষকে দেখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লাহোর সেন্ট্রাল জেলে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'কারাকাহিনী' গ্রন্থে এতৎসম্পর্কিত বিস্তৃত আলোচনা আছে।"

আবার অন্য মতে, আইন অমান্য আন্দোলন ছাড়াও ১৯৪২ সালে 'আগস্ট আন্দোলনের' সময়ও তাঁকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার করে অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল।

(দ্র. 'মাওলানা ইসলামাবাদী স্মৃতি বার্ষিকী', ইসলামাবাদী স্মৃতি সমিতি, ঢাকা ১৯৬৬, পৃ. ৮)

খিলাফত আন্দোলনের সময় তাঁর যে আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামী মনোভাব ফুটে উঠেছিল, বিপ্লবী হিসাবে তখনই তিনি সবার সম্মান ও শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। 'আল-ইসলাম' পৌষ, ১৩৭২ সংখ্যায় 'আঞ্জুমান সংক্রান্ত সংবাদ' শীর্ষক রিপোর্টে জানা যায় যে, আকরম খাঁ এবং মাওলানা

www.pathagar.com

ইসলামাবাদী স্বয়ং ঢাকা ও চট্টগ্রামে খিলাফত আন্দোলন উপলক্ষে বহু সভা-সমিতি করেছিলেন।

এই খিলাফত আন্দোলন উপলক্ষে আল ইসলাম ও ইসলাম মিশনের অনেক কাজ ইসলামাবাদী স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। বিশেষত প্রচার পুস্তিকাদি, প্যাম্পলেট ইত্যাদি প্রকাশের প্রেসের অবসর না থাকাতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাতেও সব কাজ ব্যাহত হতে থাকে বলে তিনি দুঃখিত হয়ে 'আল ইসলামে' একবার কৈফিয়ত প্রদান করেন।

মনিরুজ্জামান নিজের দিকে মনোযোগ দিতে না পারলেও খিলাফত আন্দোলনের জন্য সমাজগত অন্যান্য কাজ ও প্রকাশনার সাথে তিনি সর্বক্ষণ জড়িত থাকতেন। সংগ্রামী তুর্কীদের সাহায্যের জন্য ও সেই সম্পর্কিত সংবাদ সংগ্রহের জন্য 'মোহাম্মদী আখবার' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশিত হতো। ইসলামাবাদীও নানা পত্রিকায় এ বিষয়ে লিখতে থাকেন। কোনো কোনো পত্রিকা ইসলামাবাদী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের রচনাসহ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতো।

তুরস্কের সুলতান দামেস্ক থেকে হেজাজ পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের এক মহাপরিকল্পনা করেন। এই রেলপথের অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতায় 'হেজাজ ফান্ড কমিটি' গঠিত হয়। তাছাড়া কোনও কোনও পত্রিকা থেকে বিশেষ উদ্যোগও নেওয়া হয়। এই সময়কার একটি সংবাদ থেকে জানা যায় :

"মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ জীবন্ত পুরুষদিগের উদ্যোগে রেঙ্গুন শহর হইতে হেজাজ রেলওয়ের জন্য ইতিমধ্যে প্রায় এক লক্ষ টাকা চাঁদা গিয়াছে..."

ইসলামাবাদী তুরস্কের খলিফা ও ঐতিহ্যের এত ভক্ত ছিলেন যে, তাঁর প্রথম পত্রিকার নামকরণ ('সোলতান') থেকে খিলাফত আন্দোলন পরিচালনাকালীন প্রায় প্রতিটি কাজ সেই উদ্দেশ্যেই নিবেদিত ছিল। তুরস্ক মিত্রশক্তিবর্গের হাতে লাঞ্ছিত হলেও এবং তুরস্ক সুলতানের সমালোচনা করলেও তাঁর এই ভক্তি-শ্রদ্ধায় কখনও ভাঙ্গন ধরেনি।

তখনকার দিনে লেখকগণ লেখার বিনিময়ে পারিশ্রমিক পেতেন না। ইসলামাবাদী পরে বুদ্ধিজীবীদের অর্থ সাহায্যের জন্য যে স্বদেশী ব্যবস্থা

www.pathagar.com

করেন, সেখানেও সেই স্মৃতি বিরাজমান ছিল। তিনি এই উদ্দেশ্যে যে স্টোর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নেন, তার নাম ছিল 'খিলাফত স্টোর'। ইসলামাবাদী এ বিষয়ে নিজেই বর্ণনা দেন :

"খিলাফত রক্ষা ও খলিফার পদমর্যাদা এবং তাহার রাজ্য সংরক্ষণ-কল্পে মোছলমানগণ সর্বপ্রকার আবেদন নিবেদন ও আন্দোলন আলোচনায় কোনরূপ ফলোদয় হইল না দেখিয়া তাহারা হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। দুর্ব্বলের অস্ত্র বিলাতী বর্জ্জন, স্বদেশী গ্রহণ, বৃটিশ আদালত বর্জ্জন করিয়া জাতীয় আদালত স্থাপনপূর্ব্বক মামলা-মোকদ্দমা পরস্পর নিষ্পন্ন করা, রাজকীয় উপাধি ও সৈনিকবৃত্তি বর্জ্জন করা, সরকারকে কোন বিষয়ে সাহায্য না করা– এ সকল উপায় অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছে। ইহাতে যে খিলাফতের প্রতিকার সাধিত হইবে তাহা বলা যায় না, তবে জাতীয় স্বার্থ ও ধর্ম রক্ষার জন্য শেষ অবলম্বন যাহা দুর্ব্বলের পক্ষে সম্ভব তাহাই ধারণ করা হইতেছে। বিভিন্ন প্রদেশে স্বদেশী খিলাফত স্টোর প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতায়ও একটি স্বদেশী খিলাফত স্টোর স্থাপিত হইতে চলিয়াছে...।"

এইভাবেই বয়ে চলেছিল মাওলানা মনিরুজ্জামানের রাজনৈতিক কর্মধারা প্রবল গতিতে। অবসর কাকে বলে, তিনি তা জানতেন না। সর্বদা চিন্তা করতেন, কাজ করতেন স্বদেশ ও স্বজাতির জন্যে। তাঁর মত ত্যাগী, নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভাব আজকের সমাজে অনেক বেশী।

www.pathagar.com

ইসলাম প্রচারক ও সমাজ সংস্কারক

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ইসলামের একজন নিবেদিত খাদেম। মুন্সি মেহেরুল্লাহ ও মুন্সি জমিরুদ্দিন বিদ্যাবিনোদ উনিশ শতকের শেষপাদে গ্রামে গ্রামে মুসলমানদের আত্মসচেতন করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাদের পদাংক অনুসরণ করে পরবর্তীতে ইসলামাবাদীও এই কাজে উদ্বুদ্ধ হন।

তিনিও চেয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে চেতনা জাগুক, ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠুক পরস্পরের মধ্যে। বিশেষ করে বাংলার আলেম সমাজ একই মঞ্চে একত্রিত হবেন, এই স্বপ্ন তিনি সকল সময় দেখতেন।

চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে ইসলামাবাদী ছিলেন কুসংস্কারমুক্ত, আর উদ্যোগে ছিলেন সাহসী ও সিংহদিল। তিনি সকল সময় উন্মুখ হয়ে থাকতেন ইসলামের খেদমতে নিজেকে উৎসর্গ করার জন্যে। তিনি অপেক্ষা করতেন কোনো এক বৃহৎ আহ্বানের। আর যখন আবদুর রহিমের মত বিদগ্ধজনদের আহ্বান পেলেন, তখনই ঝাঁপিয়ে পড়লেন আপন কর্তব্যে। কেমন ছিল সেই সূচনার মুহূর্তটি? এর কিছুটা জানা যায় মিহির ও সুধাকরের ১৩০৬ সনের ৮ই পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে :

"...আমাদের পুনঃপুন অনুরোধে, আমাদের অন্যতম প্রিয় সুহৃদ কুনেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলভী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সুপরিচিত উৎসাহের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেব ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্পরূপ হইয়াছেন।"

এরপরই তিনি প্রকৃত অর্থে ইসলাম প্রচারের কাজে নিরলসভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই কাজের জন্য তিনি সমগ্র উত্তরবঙ্গ, আসাম, উত্তর ভারতসহ ছুটে বেড়িয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চল ও জনপদে। এবং কী বিস্ময়কর

www.pathagar.com

ব্যাপার, সকল স্থানেই তিনি গৃহীত হয়েছিলেন সমানভাবে। এইসব এলাকায় তিনি ব্যাপক জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। সেই সাথে তিনি সাধারণ মানুষের মধ্যে ইসলামের পক্ষে ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তাঁর পরিশ্রম সার্থক হয়েছিল সার্বিক অর্থেই।

ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি ইসলামাবাদী জনহিতকর ও জ্ঞানবিকাশের মাধ্যম হিসাবে বহুমুখী কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ছিল স্কুল-মাদ্রাসা, ইয়াতিমখানা, আরবী বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এ ধরনের কয়েকটি উজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানের সাথে এখন একটু পরিচিত হওয়া যাক।

ইসলাম মিশন

ইসলাম মিশন সমিতি স্থাপনের পূর্ব-ইতিহাসটা ইসলামাবাদী তাঁর আত্মজীবনীতে (১৯৩১) জানিয়েছেন এইভাবে :

"১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে আমি 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় আলিগড়ে স্থাপিত ভারতীয় মোছলেম শিক্ষা সমিতির অনুকরণে বাংলাদেশে প্রাদেশিক মোছলেম শিক্ষা সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা জ্ঞাপনপূর্বক জ্বালাময়ী প্রবন্ধ প্রকাশ করি।

ইত্যবসরে কলিকাতা হাইকোর্টের সমাজবৎসল এডভোকেট মৌলভী ওয়াজেদ হোছায়েন বি.এল. সাহেব আমার প্রাণের ডাকে সাড়া দিয়ে বঙ্গীয় মোছলেম শিক্ষা সমিতি গড়িতে অগ্রসর হন। রাজশাহীর মহাপ্রাণ কর্মা কিমিয়া ছাদতের বঙ্গানুবাদকারী মৌলভী মির্জা ইউছুফ আলী সাহেব রাজশাহী জিলার সদরে মোছলেম শিক্ষা কনফারেন্স প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হন। এই কনফারেন্সের সফলতার জন্য আমি কলিকাতা ও রাজশাহী হইতে পুনঃপুন অনুরুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মদেশ হইতে ৯ মাস ভ্রমণান্তে চট্টগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হই।...

এই কনফারেন্সের সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে এছলাম মিশনের কার্য সম্পন্ন হয়, তজ্জন্য এই অধম সংবাদপত্রের মধ্যস্থতায় বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করি। তাহার ফলে বিহারের প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ মওলানা কারী ছোলেমান ফুলওয়ারী, মওলানা আবদুল কাদের শাহ সারাসী, বাগ্মী প্রবর মুন্সী মেহেরউল্লাহ, কবি

www.pathagar.com

প্রবর সমাজগতপ্রাণ বাগ্মীকুলতিলক মৌলভী এছমাঈল হোসেন সিরাজী সাহেব প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ বক্তাবর্গ সভায় আহূত হইয়াছিলেন। তাহাদের দ্বারা ইসলামের মাহাত্ম্য সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করান হয়। এখান হইতেই এছলাম মিশনের সূত্রপাত ও কার্যারম্ভ হয়।"

মাওলানা ইসলামাবাদী যে পরিবেশে ইসলাম মিশন গঠন করেন এবং তার জন্যে জীবন উৎসর্গ করে পরিশ্রম শুরু করেন, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের পক্ষে তা খুব অনুকূল ছিল না। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'আল ইসলামের' একটি বিভাগীয় প্রবন্ধে উল্লেখ করেন :

"...সমাজে এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা 'আল ইসলাম', 'মোহাম্মদী', 'ইসলাম মিশন' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে লোক সাধারণকে উত্তেজিত করিতেছেন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ মাওলানা শ্রেণীর লোক।..."

আঞ্জুমানে ওলামার সাথে এক সময় এই মিশন যুক্ত হয়। ইসলামাবাদী নিজেই (১৯৩১) বলেন :

"১৯১৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে যখন এই অধমের এবং অন্যান্য কতিপয় আলেমের চেষ্টায় আঞ্জুমানে ওলামার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এছলাম মিশনের কার্য শিক্ষা সমিতির পরিবর্তে উক্ত আঞ্জুমানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া যায়। ১৯১৪ হইতে ১৯১৯ পর্যন্ত 'আঞ্জুমানের ওলামার' তত্ত্বাবধানে ইসলাম মিশনের কার্য প্রবল ও বিস্তৃতভাবে সম্পাদিত হইতে থাকে। এ সময় মিশনের প্রচারক সংখ্যা ৬০ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল... সত্য কথা বলিতে কি আঞ্জুমানে ওলামা ও তদধীন এছলাম মিশনের দ্বারা সমাজের যে জাগরণ সঞ্চার হইয়াছিল, বাংলার মুসলিম সমাজের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সেরূপ আর কখনো হইয়াছিল কিনা সন্দেহ।"

ইসলাম মিশনের কাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্যে ও বাইরের জগতে এর উদ্দেশ্য তুলে ধরার জন্যে এই সময়ই (১৩২২) তিনি 'আল-ইসলাম' এবং 'দৈনিক আমীর' প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

আঞ্জুমান

মুসলমানদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টির জন্যে বাংলাদেশের অগ্রসরশীল ও চিন্তাবিদ মুসলমানেরা উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমভাগে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঞ্জুমান গঠন করেন। শেষ পর্যায়ে এটা একটা বিশেষ আন্দোলনে পরিণত হয়। ইংরেজ ও মুসলমানদের সম্পর্কের অবনতিরোধ কামনার ভিত্তিতেই এইসব আঞ্জুমানের সৃষ্টি হয়েছিল।

আঞ্জুমান কর্মীগণের অধিকাংশই পেশা হিসাবে সাংবাদিকতা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের ভূমিকা ছিল প্রচারক বা সংস্কারকের। মুসলিম জাতির অতীত গৌরব-কথা প্রচার ও ধর্ম-সংস্কার ছিল এদের প্রধান উদ্দেশ্য। তবে পাশ্চাত্য মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের চিন্তাও এদের ছিল।

১৯০৩-৩২ সাল পর্যন্ত আঞ্জুমানে ওলামার সাথে ইসলাম মিশন, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমাজ, খাদেমুল ইসলাম সমিতি, খিলাফত কমিটি প্রভৃতির কখনও কোনও বিরোধ ছিল না, বরং একে অপরের অঙ্গীভূত হয়েই প্রকাশিত হয়েছিল। আঞ্জুমানের উদ্যোগে, বিশেষত বিংশ শতকে এসে, বিভিন্ন শিক্ষা সম্মেলন, সাহিত্য এমনকি রাজনৈতিক কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হতো। প্রচারকদের উদ্যোগে পত্র-পত্রিকায়ও তার রিপোর্ট প্রভৃতি প্রকাশ পেত। আঞ্জুমান সংগঠনের পেছনে অগ্রগতির চিন্তাটাই ছিল প্রধান।

মাওলানা ইসলামাবাদী ইসলাম মিশনের কাজ উপলক্ষে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আঞ্জুমানের সঙ্গে জড়িত হন। তিনি ১৯১১ সনে যেমন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন, পরবর্তী শিক্ষা সম্মেলনসমূহেও তাঁর অবদান ছিল তেমনি উল্লেখযোগ্য। এসব কাজে আলেম সমাজের এবং তৎকালীন মুসলমান সমাজের সার্বিক দায়িত্ব ক্রমশ তার ওপর এসে পড়লে তিনি 'আঞ্জুমানে ওলামা', 'জমইয়াতে ওলামা' প্রভৃতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন এবং বঙ্গীয় মুসলিম শিক্ষা সমিতি ও বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অধিবেশনের জন্যেও উদ্যোগী হন।

www.pathagar.com

তিনি একটা নির্দিষ্ট কার্যক্রম ও সংকল্প নিয়ে মুসলিম সমাজের পতন ও ভাঙনের মুকাবিলায় সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তখন আলেম সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে একটা অনুকূল পরিবেশের প্রয়োজন ছিল। তৎকালে উত্তরবঙ্গ, পূর্ববাংলা, পূর্ণিয়া, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে যেসব আলেম-সম্মেলন হতো এবং মাওলানা ফুলওয়ারী, মাওলানা কাদের বক্‌শ, মুনশী মেহেরুল্লাহ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ একক ও পৃথকভাবে সমাজের গৃহবিবাদ মেটানোর যে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন তার ফলেই ১৯১৯ সালে এই আঞ্জুমান বা আলেম সমিতি গঠন করতে তিনি উৎসাহ পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়াও পেলেন সর্বত্র।

আগেই বলা হয়েছে যে, মাওলানা মনিরুজ্জামান সমাজ সংস্কারক হিসাবেও বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। এর মধ্যে ছিল স্কুল-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা আন্দোলন, সামাজিক আন্দোলন ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নারী কল্যাণমূলক উদ্যোগ, মানবতার সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা নির্মাণ প্রভৃতি। তিনি সুদমুক্ত ব্যাংকিং ব্যবস্থা নিয়েও গভীরভাবে ভাবতেন– যা তার রচনাবলীর তালিকা থেকেও জানা যায়।

www.pathagar.com

আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলাম মিশনের কার্যাবলী ও মনিরুজ্জানের চিন্তা এবং কর্মজীবনের সম্যক ধারণা নিতে তাঁর আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নের কথা স্বভাবতই এসে পড়ে। সমাজের পরিচয়বর্ধক ও পথপরিচালক কিংবা বিজাতি-বিধর্মীর সমালোচনা ও প্রচারণা প্রতিহত করার মত এমন কোনও প্রতিষ্ঠান আমাদের দেশে ছিল না, যেখান থেকে যুক্তিতর্ক ও শাস্ত্রগত প্রমাণে ইসলামের ও অনুশাসনসমূহের মাহাত্ম্য প্রচার ও তার প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভব হতে পারে। মানসিক বা ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবন এমনকি রাজনৈতিক জীবনকে নতুনভাবে সাজানোর প্রয়োজনটা মনিরুজ্জামান বুঝতে পারেন। ইসলামাবাদী এর অভাবটা মর্মে মর্মে অনুভব করে ১৯১৫ সাল থেকেই আরবী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি বিভিন্ন পত্রিকায়, বিশেষত 'মোহাম্মদী'তে লেখা শুরু করেন। এই সময়ে উর্দু ভাষায় পুস্তকাকারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। খিলাফত আন্দোলনের সময় সাময়িকভাবে তাতে কিছুটা অবশ্য ভাটা পড়ে, তবু আজীবন তিনি এ সমস্যা নিয়েই ভেবেছেন, আলোচনা করেছেন, আন্দোলন করেছেন। আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পেছনে ইসলামাবাদীর চিন্তা ছিল :

১. দেশ-বিদেশের গুণী-জ্ঞানীর সম্মিলনে একটি পূর্ণাবয়ব ও উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং সেইরূপ শিক্ষকমণ্ডলীর সাহায্যে দেশে রেনেসাঁর সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করা।

২. ছাত্রদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ও যুক্তিবাদের প্রসারণের সাথে সাথে তাদের পরিশ্রমী, সংযমী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও স্বাধীনতাকামী করে গড়ে তোলা এবং এভাবে সমাজ ও দেশের বৃহত্তর কর্তব্যের দ্বারে তাদের পৌঁছে দেওয়া।

www.pathagar.com

৩. পাঠ্য বই-এর (প্রচলিত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান মাধ্যম) বাইরে ছাত্রদের চিত্তবৃত্তি বিকাশের উপযোগী যথার্থ ও প্রয়োজনীয় শিক্ষাটিকে চিহ্নিত করা ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আরবীতে শিক্ষা দেওয়া।

আর এ প্রসঙ্গে ইসলামাবাদীর ভাষ্য ছিল :

"আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আমরা মানুষের মত মানুষ গড়াইতে চাহি, স্বজাতি বৎসল, সমাজ হিতৈষী দেশগতপ্রাণ ধার্মিক চরিত্রবান লোক গড়ানই আমাদের অভিপ্রেত।"

হাকিম আলতাফুর রহমান বলেন :

"আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একটি উদ্দেশ্য চরিত্রবান লোক তৈয়ার করা। বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ যাতে সক্ষম হয়, সেদিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

অমুসলমানগণের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে, খৃষ্টান পাদরী ও আর্যমিশনারীদের হামলা হইতে ইসলাম ও মুসলমানকে বাঁচাইতে হইলে, বিজাতী ও বিধর্মীদের মধ্যে ইসলামের পবিত্র আলো বিকীর্ণ করিতে হইলে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক নূতন ছাঁচে সময়োপযোগী আলেম বা প্রচারক গঠন করা ব্যতীত যে গত্যন্তর নাই, ইহা মাওলানা ইসলামাবাদী সাহেব তাঁহার সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

বস্তুত, মনিরুজ্জামান আমৃত্যু এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করে গেছেন। এজন্য তিনি ব্রহ্মদেশ– মিশর একটি আন্দোলনও গড়ে তোলেন। অবশ্য এ ইচ্ছা নিয়েই তিনি ব্রহ্মদেশে ও অন্যত্র মিশনারী ট্রেনিং সেন্টার এবং কদম মোবারক এতিমখানা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেছিলেন। তিনি ঘরে বসে কেবল প্লান-প্রোগ্রাম তৈরি করেননি– দার্শনিকের মতো কেবল সূত্র ও পরিকল্পনা ব্যাখ্যায় নিমগ্ন থাকেননি– বাস্তবেও তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। তিনি পাক-ভারতের যাবতীয় হিন্দু মিশনারী কেন্দ্রগুলিতে ঘুরে ঘুরে সেখানকার জীবনযাত্রা প্রণালী ও শিক্ষাপদ্ধতি, আয়ব্যবস্থা প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আহরণ করেন। ১৯১৯ সালে মাওলানা হযরত মোহানীর সাথে সাক্ষাৎ করে এ বিষয়ে তিনি আরো তথ্য ও জ্ঞান লাভ করেন এবং তারই পরামর্শ অনুসারে গুরুকূল বিশ্ববিদ্যালয়ে যান ও সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন।

www.pathagar.com

মনিরুজ্জামান কেবল এই মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যেই পাক-ভারতের দেওবন্দ, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বাঁশবেরেলী প্রভৃতি স্থানের আরবী শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ এবং ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (হায়দরাবাদ) সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে সংগ্রহ করেন। আরবী বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের জন্যে সর্বশেষে তিনি আল-আজহার (মিশর) পর্যন্ত পরিদর্শন করেন।

দেয়াং পাহাড় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে নির্বাচিত স্থানটি চট্টগ্রাম থেকে সোজা সাত মাইল দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলির মোহনার পূর্বতীরে বদরপুরায় অবস্থিত। এটি পটিয়া থানার বড় উঠানের দেয়াং পর্বত শ্রেণীর একটি বৃহৎ অংশ। উক্ত অঞ্চলের জমিদার জনাব আনোয়ার আলী খাঁ চৌধুরী সাহেব রেজিস্ট্রিযোগে সেখানে প্রায় ৫০০ কানী জমি এই উদ্দেশ্যে দানপত্র করে দেন। এছাড়া ইসলামাবাদী স্বয়ং তৎকালীন বঙ্গ সরকারের নিকট থেকে আরো ৬০০ বিঘা জমি বন্দোবস্ত করে নিয়েছিলেন।

এই দেয়াং-এ প্রাথমিক কাজ হিসাবে একটি স্কুল এবং মাছ, ভেড়া ও মুরগি চাষের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল। সামগ্রিক সহানুভূতি ও প্রয়োজনীয় অর্থাভাবে বাকি কাজ সমাপ্ত হয়নি।

দেয়াং-এ স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ইসলামাবাদীর একক কোন মত বা প্রভাব ছিল না। এ বিষয়ে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানের মাওলানা, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ ও বিশিষ্ট আলেম ও বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সহযোগীদের একটি তালিকাও পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি সর্বভারতীয় ওলামায়ে কেরামের অনুমোদন লাভের জন্যে চট্টগ্রামে সাতদিন ব্যাপী 'নিখিল ভারত আঞ্জুমানে ওলামার' এক মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। পাক-ভারতের সকল মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ওলামায়ে কেরাম, পীর-মাশায়েখদের এক বিরাট প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন।

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা আকরম খাঁ, মুন্সী রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ এর গঠনতন্ত্র ও অনুশাসন সম্পর্কিত পদ্ধতি ও পরিকল্পনাদি লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। শেরে হিন্দ মাওলানা শওকত আলী এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি

www.pathagar.com

স্থাপন করেন। জঙ্গে জেহাদ শাহ্ বদিউল আলম শাহ্ জুলফিকার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবল সমর্থক হন এবং সেক্রেটারী হিসাবে চট্টগ্রামে থাকতেও রাজি হন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনের পর বিভিন্ন পত্রিকায় এ সংবাদ প্রচারিত হলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে তার জন্যে মুবারকবাদ আসতে থাকে। ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে এটি হতো ইসলামাবাদীর জীবনের ও পাক-ভারতের মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। সুদূর মিশরেও এজন্যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল।

ইসলামাবাদীর স্বপ্নস্বরূপ সেই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়নি সত্য, কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে তিনি অগণিত মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসনে চিহ্নিত হয়ে আছেন। মৃত্যুর কিছু দিন আগে পর্যন্ত এ ব্যাপারে তাঁর কাছে বহু চিঠিপত্র আসতো, বহু জ্ঞানী-গুণীজন তাঁর সাথে দেখা করতে আসতেন।

www.pathagar.com

স্মরণীয় সেই দিনগুলি

তুরস্ক ও অটোম্যান সাম্রাজ্যের কয়েকটি প্রদেশ বৃটিশদের হাতে চলে যাবার পূর্বেই খিলাফত আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

মুসলিম বিশ্বে এবং ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ শুরু হয়ে যায়।

১৯১৯ সালের ২৭শে অক্টোবর সারা ভারতে 'খিলাফত দিবস' পালন করা হয়।

১৯১৯ সালের ২৩শে নভেম্বর দিল্লীতে হিন্দু ও মুসলমানের যৌথ সমাবেশে 'খিলাফত কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ গান্ধীও খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন।

চলতে থাকে বৃটিশদের সাথে অসহযোগিতা আন্দোলন। এর ফলে বিলেতী দ্রব্যসামগ্রী, অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সবই বর্জন করা হয়।

১৯২০ সাল।

এই সময়ে আন্দোলনের অংশ হিসাবে 'নবাব বাড়ি' বলে খ্যাত ঢাকার আহসান মঞ্জিলে অনুষ্ঠিত হয় এক ঐতিহাসিক সম্মেলন। সম্মেলনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মাওলানা মনিরুজ্জামানসহ এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন– নওয়াব খাজা হাবিবুল্লাহ, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা আকরম খাঁ, মাওলানা আযাদ সোবহানী, মৌলভী মজিবুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। এরপর মুসলিম লীগে যান।

www.pathagar.com

কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, কংগ্রেসে থেকে মুসলমানদের কোনো রকম স্বার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হবে না।

কংগ্রেসের নীতি-নৈতিকতা এবং কর্ম-পদ্ধতির সাথেও মাওলানা দ্বিমত পোষণ করতেন।

কংগ্রেস থেকে মুসলিম লীগে যোগদান করেও মাওলানা মনিরুজ্জামান স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। তিনি চাচ্ছিলেন হতভাগ্য মুসলমানের দুঃখ-দুর্দশা দূর করতে। এটাই ছিল তাঁর রাজনীতির একটি মহৎ উদ্দেশ্য।

কিন্তু তিনি বার বার প্রতিটি দল থেকেই আশাহত হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হচ্ছিলেন।

মুসলিম লীগ থেকে ফিরে এসে তিনি যোগ দেন 'কৃষক-প্রজা পার্টি'তে।

এখানে এসে তিনি তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন জনগণের সেবায়।

দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর মনিরুজ্জামানের রাজনৈতিক জীবনে কিছুটা স্থিতিশীলতা এলো। তিনি প্রশান্ত হৃদয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল সাধারণ গরীব-দুঃখীর ভাগ্য পরিবর্তন।

মাওলানা মনিরুজ্জামান প্রথমে জেলা বোর্ডের ও পরে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩৭ সালে কৃষক-প্রজা পার্টির টিকেটে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পার্টির বাইশজন পরিষদ সদস্যের মধ্যে মনিরুজ্জামান ছাড়াও ছিলেন জনাব শামসুদ্দীন, জনাব জালালউদ্দীন হাশেমী, সৈয়দ নওশের আলী, জনাব হুমায়ুন কবির প্রমুখ।

এদের উদ্যোগে প্রথমে 'দৈনিক কৃষক' ও পরে 'দৈনিক নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির সহ-সভাপতি এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক পরিষদের উপ-নেতা হিসাবে মনিরুজ্জামান তাঁর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সর্বদা তৎপর ছিলেন।

শেরে বাংলাকে তিনি সর্বদা উত্তম ও কল্যাণকর পরামর্শ দিতেন। শেরে বাংলাও মনিরুজ্জামানের পরামর্শের প্রতি ছিলেন গভীর শ্রদ্ধাশীল।

www.pathagar.com

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক বিরল ব্যক্তিত্ব

মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তাঁর চরিত্র ও আদর্শ ছিল আকর্ষণীয়। তাঁর এই ব্যক্তিত্বই তাঁকে অন্যের কাছে অনুকরণীয় করে তুলতো।

সম্পাদনা, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক জীবনে তিনি মিশেছেন অসংখ্য মানুষের সাথে। তাঁদের কেউবা হিন্দু, কেউবা মুসলমান, আবার কেউবা ছিল অন্য ধর্মাবলম্বী।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, মনিরুজ্জামান যার সাথেই মিশুন না কেন, তিনি স্বজাতির আদর্শ ও ঐতিহ্যকে কখনো বিলীন করে দেননি। বরং যখন যেখানেই গেছেন, যাদের সাথেই মিশেছেন– সেখানেই তিনি ইসলামের সুমহান আদর্শকে উচ্চকিত করে তুলে ধরেছেন।

রাজনৈতিক কারণেই মনিরুজ্জামানের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিল নেতাজী সুভাষ বসুর। কিন্তু নামাযের সময় হলেই যে কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বা আলোচনা বন্ধ রেখে মনিরুজ্জামান নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। মাওলানা মনিরুজ্জামানের চরিত্রের এই সকল বিশেষ গুণ দেখে নেতাজী সুভাষ বসুও মুগ্ধ হয়ে যেতেন। তিনিও মাওলানার চরিত্রের মাধুর্য লক্ষ্য করে প্রভাবিত হন। যার কারণে, নেতাজী ইসলামের প্রতি কিছুটা হলেও ঝুঁকে পড়েন। তিনি মাওলানাকে অনুরোধ করেন তাকে নামায পড়া শিখিয়ে দেবার জন্যে।

নেতাজী সুভাষ বসুর আগ্রহ লক্ষ্য করে মাওলানা মনিরুজ্জামান তাকে একটি নামায শিক্ষার বইও সংগ্রহ করে দেন।

কেবল নেতাজী নন, তখনকার সময়ের সকলেই মনিরুজ্জামানকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও মাওলানা মনিরুজ্জামানকে খুব গুরুত্বের চোখে দেখতেন এবং তাকে সম্মান করতেন।

www.pathagar.com

তিনিও কাউকে অহেতুক অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করতেন না। এজন্যে তিনিও পেয়েছেন অঢেল মর্যাদা। এ প্রসংগে চমৎকার একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

একবার আসামে কংগ্রেসের সম্মেলনে মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীকে কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে অভ্যর্থনা জানান মাওলানা মনিরুজ্জামান।

আসামের তখন প্রধানমন্ত্রী শ্রবরদুলই।

তিনি মনিরুজ্জামানের এই বিষয়টি লক্ষ্য করলেন। মহাত্মা গান্ধীকে বললেন, দেখুন!

মহাত্মা গান্ধী সামান্য হেসে শ্রবরদুলইকে বললেন,

"মাওলানা মনিরুজ্জামানের হৃদয় প্রশান্ত মহাসাগরের মতো। মাওলানা মাদানীকে সম্মান প্রদর্শনের অর্থ নিশ্চয় আমাদের কাউকে অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করা নয়।"

গুণীর সম্মান যে কেবল গুণীরাই দিতে পারেন, এই ঘটনায় তা আর একবার সত্য হয়ে উঠলো।

www.pathagar.com

একটি অবিস্মরণীয় স্মৃতিচারণ

নেতাজী সুভাষ বসুর সাথে মাওলানা মনিরুজ্জামানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছিল। স্থানটি ছিল আকিয়াব।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের বিজেন মুখোপাধ্যায়।

বিজেন মুখোপাধ্যায় পরে তার এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন মনিরুজ্জামানের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে চমৎকার কিছু বিষয়।

প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছিল 'মাসিক বসুমতি'তে। বাংলা ১৩৭৯ সালে। বিজেন মুখোপাধ্যায় লিখেছিলেন :

"মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে চট্টগ্রামের উগ্রজাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের অগ্রদূত বলা যায়। এই সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধের সংগে আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে আমাদের পত্রিকার (দৈনিক কৃষক) সম্পাদক আমার বিশিষ্ট বন্ধু সিরাজ উদ্দীনের মারফত। অত্যধিক মনোবলসম্পন্ন অথচ স্বল্পভাষী এই বৃদ্ধ। এঁরা এমনি ধরনের লোক যারা সভায় বা কোন অনুষ্ঠানের ব্যাক বেঞ্চে এসে চুপিচুপি বসে থাকেন ভাল মানুষটির মতো। হঠাৎ চোখে পড়লেও অনেকে পাশ কাটিয়ে যাবেন অতি সাধারণ বা তার চাইতেও নিম্নস্তরের অনুল্লেখযোগ্য কাউকে মনে করে। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলেও বক্তৃতা মঞ্চে এসে এঁরা নিজেদের পরিচয় দিতে সীমাহীন সংকোচবোধ করেন। প্রস্তাব উত্থাপন ও সমর্থনের ঝামেলা এড়িয়ে এঁরা শুধু প্রয়োজনের সময় হস্ত উত্তোলনেই কাজ শেষ করে ফেলতে চান। এঁরা চলেন রাজপথ এড়িয়ে অলিগলি দিয়ে সন্ধ্যার আবহাওয়ায় লোক-চক্ষুর অন্তরালে। পরিচিতির গালভরা বুলি উচ্চারণ করে এঁরা নিজেদের ঢাক পেটান না। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় শুভ্রশ্মশ্রু ও শুভ্রকেশ এই বৃদ্ধ মুসলমানকে প্রায়ই আমার কাছে মনে হয়েছে প্রাচীন কালের ঋষির মতো। অনেকবার গেছি তাঁর বাসায় ও অনেকদিন অনেক কথাই আলোচনা হয়েছে তাঁর সঙ্গে।"

www.pathagar.com

গোপনে ইশতেহার প্রচার

১৯৪২।

মাওলানা ইসলামাবাদী এ সময়ে এক দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেন। তিনি পরিচয় দেন এক সাহসী সেনাপতির।

মনিরুজ্জামান এই সময়ে বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বৃটিশকে তাড়িয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলা ও আসামের মুসলমানদেরকে নিয়ে একটি গোপন বিপ্লবী বাহিনী গঠন করেন।

এর অফিস ছিল কলকাতার ১৫ ধর্মতলা স্ট্রীটে।

এ সময়ে মাওলানা মনিরুজ্জামান প্রায় এক লাখ টাকা খরচ করে কয়েক লাখ কপি ইশতেহার ছাপান। এবং তা সর্বত্র প্রচার করার ব্যবস্থা করেন।

এই ইশতেহারে বৃটিশদের যাবতীয় কুকীর্তির বিশদ বর্ণনা ছিল।

উপমহাদেশে সেদিন ছিল এক সংকটাপন্ন পরিবেশ। চারদিকে কেবল অশান্তির দাবদাহ। দাউ দাউ করে জ্বলছে বিপ্লবের তীব্র আগুন।

স্বাধীনতার এই মুক্তি-সংগ্রামে সেদিন সিংহের মতো গর্জে উঠেছিলেন নির্ভীক বীর পুরুষ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

মনিরুজ্জামান সেদিন নেতাজী সুভাষ বসুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন বৃটিশকে এ ভূখণ্ড থেকে উৎখাত করার জন্যে। এ কাজে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করেননি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছিলেন আত্মনিবেদিত এক দুঃসাহসী বীরপুরুষ।

স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে যে কোন ঝুঁকি গ্রহণেও তিনি ছিলেন সদা প্রস্তুত।

www.pathagar.com

কারাবরণ

১৯৪৪।

মাওলানা মনিরুজ্জামানের বয়স তখন উনসত্তর বছর। এই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন স্বাধীনতার। স্বপ্ন দেখতেন একটি স্বাধীন ভূখণ্ডের। স্বপ্ন দেখতেন একটি স্বাধীন পতাকা এবং একটি স্বাধীন জাতির।

ইংরেজদের কালো থাবা থেকে এ জাতিকে মুক্ত করার জন্যে এই বৃদ্ধ বয়সেও মনিরুজ্জামানের রক্তে ছুটতো অগ্নিহাওয়া।

এ সময়ে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সুবোধ চক্রবর্তীর সাথে পরিচিত হন মাওলানা মনিরুজ্জামান। সুবোধের সাথে আলাপ করে স্বাধীনতাকামী মনিরুজ্জামান উনসত্তর বছর বয়সেও একজন তেজী যুবকের মতো সাহসী হয়ে ওঠেন। জেনে-বুঝেই তিনি এই বৃদ্ধ বয়সে নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এক বিরাট ভয়াবহ ঝুঁকি।

সুবোধ তাঁর সাথে আছেন। মাওলানা তাকে নিয়ে রওয়ানা দিলেন নিজের মাতৃভূমি চট্টগ্রামের দিকে। পাহাড়-পর্বত সংকুল অরণ্য আর বন্ধুর পথ অতিক্রম করে অগ্রসর হচ্ছেন তিনি।

উদ্দেশ্য ছিল আরাকানের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে নেতাজীর সাথে যোগাযোগ করা এবং পরবর্তী কর্মসূচী প্রণয়ন করা।

কিন্তু সীমান্তে ছিল কড়া সতর্ক প্রহরা।

আজাদ ফৌজের দখলে আরাকান চলে যাবার কারণে তাদের সেই প্রহরা ছিল আরও তীব্র এবং দুর্ভেদ্য। যে কোন মানুষের জন্যেই ছিল সেই গন্তব্য অত্যন্ত মারাত্মক। যে কোন মুহূর্তে প্রহরীদের একটি মাত্র বুলেটে শেষ হতে পারে তরতাজা প্রাণ।

সীমান্তের সিংহদ্বারে পৌঁছে গেছেন মনিরুজ্জামান। হাঁটছেন খুবই সন্তর্পণে। সঙ্গীকে বললেন,

www.pathagar.com

"আমার জীবনের আর মাত্র কয়েকটি দিন অবশিষ্ট আছে। চরম ঝুঁকি নেয়ার অসুবিধে আমার আদৌ নেই।"

এ কথা বলেই তিনি নিজের শ্যালক মোর্শেদ আলী খোন্দকারকে সাথে নিয়ে একজন সামান্য ফকিরের বেশে শত্রুর বেষ্টনী ভেদ করে চলে যান নেতাজীর কাছে। নেতাজীর সাথে তার আলাপ হয়।

কিন্তু ইসলামাবাদীর এই দুঃসাহসিক অভিযানের খবর তাৎক্ষণিকভাবে বৃটিশ শত্রুরা জানতে না পারলেও পরক্ষণে তাদের আর কিছুই জানতে বাকী থাকলো না।

তাদের গুপ্তচরেরা সব গোপন খবরই সংগ্রহ করে ফেললো। তাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়ানো কিছুতেই সম্ভব হয়নি। ফলে, বৃটিশদের বিপুল সংখ্যক পুলিশ মুহূর্তেই ঘেরাও করে ফেলে মনিরুজ্জামানের কলকাতার বাসস্থান, চট্টগ্রাম শহরের বাড়ি, সীতাকুণ্ডের খামার আর পটিয়ার বাড়ি। তন্ন তন্ন করে তারা খুঁজতে থাকে মনিরুজ্জামানকে।

অবশেষে মাওলানা মনিরুজ্জামান তাঁর বহু সহচরসহ গ্রেফতার হন পুলিশের হাতে। সনটি ছিল ১৩ই অক্টোবর ১৯৪৪।

সীতাকুণ্ডের খামার বাড়ি থেকে পুলিশ প্রচুর পরিমাণে বৃটিশ বিরোধী প্রচার পত্র, বইপত্র এবং পরিকল্পনার কাগজপত্রও আটক করে।

মাওলানা মনিরুজ্জামানকে গ্রেফতার করে কলকাতা ও দিল্লী হয়ে তারপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় লাহোরের ঐতিহাসিক দুর্গে।

এখানে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয় এবং তাঁর ওপর চালানো হয় অমানুষিক নিষ্ঠুর নির্যাতন।

কিন্তু নিদারুণ নির্যাতন আর কষ্ট ভোগের পরও সিংহপুরুষ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এতটুকু মাথা নোয়াননি বৃটিশ পাষণ্ডদের কাছে। তখনো তাঁর কণ্ঠ ছিল উচ্চকিত এবং অকম্পিত। শত চেষ্টাতেও পারেনি তারা মনিরুজ্জামানের উনসত্তর বছরের সেই তেজদীপ্ত কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে। অবশেষে বৃটিশরা বাধ্য হয় মাওলানা মনিরুজ্জামানকে মুক্তি দিতে। কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন মাওলানা মনিরুজ্জামান। তার মুক্তির সনটি ছিল ১৯৪৫।

www.pathagar.com

পরবর্তী সংগ্রাম

মনিরুজ্জামান এক সময় চট্টগ্রাম মুসলিম লীগের সভাপতি ছিলেন।

পরে অসংখ্য মানুষের দুঃখ দুর্দশায় তিনি আহত হন। এসব নিরন্ন-নিরাশ্রয়ী মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবার তাকিদ অনুভব করেন। তিনি বুঝতে পারলেন, শুধু রাজনীতি দিয়ে এসব বঞ্চিত-ক্ষুধার্ত মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হলে চাই বাস্তবমুখী কর্মসূচী এবং উদ্যোগ।

মনিরুজ্জামান ছিলেন বাস্তববাদী। তিনি শুধু বক্তৃতার ফানুসে বিশ্বাসী ছিলেন না। এ জন্যে মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি নিখিল বঙ্গ কৃষক প্রজা সমিতিতে যোগ দেন।

ইসলাম সম্পর্কে এবং দীন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মনিরুজ্জামানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

"আমি মুসলিম ব্যতীত অন্য শ্রেণীর লোকের নেতৃত্বাধীনে ইসলামের তথা মুসলিম জাতির উন্নতির পথ প্রশস্ত হওয়ার উপায় আছে বলে বিশ্বাস করি না। যে নেতা স্বয়ং শরীয়তের দায়রার অধীন থাকবে না, কুরআন হাদীস মতে চলবে না, তাঁর পক্ষে মুসলমানের নেতৃত্ব করার কোন অধিকার থাকতে পারে না।"

মনিরুজ্জামান আলিমদের ঐক্যবদ্ধ, কর্মঠ ও আজাদী সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্যে সারা জীবন চেষ্টা করেছেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবেও যে কোনো মূল্যে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের তিনি ছিলেন একজন সক্রিয় কর্মী বা সাহসী সৈনিক।

www.pathagar.com

মনিরুজ্জামান শুধু খিলাফত আন্দোলনেই অংশগ্রহণ করেননি, ১৯০৮ সালে লিবিয়ার ত্রিপলী যুদ্ধ ও ১৯২২ সালে বলকান যুদ্ধের সময় তিনি দেশব্যাপী আন্দোলনও গড়ে তুলেছিলেন। বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার কারণেই তিনি ১৯৪৪ সালে কারারুদ্ধ হন।

মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন আজাদী সংগ্রামের অগ্রসেনানী।

বাস্তব জীবনে ছিলেন ইসলামী মূল্যবোধে উজ্জীবিত একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। সৎ, পরিশ্রমী, নিরলস এক কর্মী হিসাবে তিনি আজীবন মানুষের জন্যে কাজ করে গেছেন।

বাংলার মুসলমানদের স্বাধীনতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং তাদের আত্মমর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যে মনিরুজ্জামানের আত্মত্যাগের কোনো তুলনা হয় না।

www.pathagar.com

যখন তিনি ঘুমিয়ে গেলেন

মুসলিম সমাজের এক চরম দুর্দিনে মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

মুসলমানকে এই দুর্দশার কালো ছোবল থেকে রক্ষার জন্যে মাওলানা মনিরুজ্জামান আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাঁর একমাত্র স্বপ্ন ছিল মুসলিম জাতিকে জাগানো। তাদেরকে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা। এ জন্যে মাওলানা মনিরুজ্জামান তাঁর জীবনের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

১৯৫০ সালের ২৪শে অক্টোবর।

মাওলানা মনিরুজ্জামানের দীর্ঘ এবং বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে এই দিনে। চট্টগ্রামে।

চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে গেলেন একজন বিপ্লবী আলিম, মুসলিম জাগরণের অগ্রসেনানী, এ উপমহাদেশের কৃতী সন্তান– মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল পঁচাত্তর বছর।

মাওলানা মনিরুজ্জামান আজ আর নেই। তবুও বেঁচে আছে তাঁর সংগ্রামী জীবনের আলোকিত ইতিহাস। তিনি বেঁচে আছেন অসংখ্য মানুষের হৃদয়ে। তাদের ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধার আবর্তে তিনি বেঁচে থাকবেন চিরকাল। ইতিহাসই অমর করে রাখবে এই সংগ্রামী সাহসী পুরুষ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীকে।

ইসলামাবাদী আজীবন জনহিতকর ও জাতীয় উন্নতিমূলক নানা কাজে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে আমাদের কাছে তাঁর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর জীবন নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই কেটেছে। কেটেছে কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ইচ্ছা করলে তিনি সুখে আরামে আয়েশে দিনাতিপাত করতে পারতেন। পারতেন প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হতে। কিন্তু দুঃখীদের ক্রন্দন, জাতির হতাশা তাঁকে চিরদিন অস্থির রেখেছিল। তিনি সমস্ত আত্মসুখ ত্যাগ করে পর-দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

www.pathagar.com

ইসলামাবাদী নিতান্ত কপর্দকশূন্যভাবে শেষ ক'টা দিন অতিবাহিত করেন। বহুবার বহু ধনী ব্যক্তি তাঁর কাছে ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জানাবার ওছিলায় নানা উপঢৌকন ও অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তিনি কখনও তা স্পর্শ করেননি। বহুবার তাঁকে প্রলোভনে ফেলার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাঁকে কেউই তাঁর বিশ্বাস ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হয়নি। একবার এক ধনী লোকের বাড়িতে তিনি মেহমান হন। ধনী লোকটির বহু অনুরোধেই তিনি তার গৃহে আগমন করেন। মাওলানা সে বাড়িতে গিয়ে দেখেন একশ' টাকার নোটের বান্ডেল একটি থালায় রেখে লোকটি তাঁর আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে। মাওলানা ইসলামাবাদী গিয়ে উপস্থিত হতেই সেই টাকার বান্ডেলটি তাঁর সামনে পেশ করলো। বিস্মিত মাওলানা তৎক্ষণাৎ আসন থেকে উঠে বললেন,

"এরূপ টাকা কখনও কোথাও আমি এ জীবনে গ্রহণ করি নাই। জীবনে বহু লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি, নিজে ব্যয় করিয়াছি, সমাজ ও কওমের খেদমত করিয়াছি কিন্তু 'এনাম' গ্রহণের কোন ঘৃণ্য মওকা হইতে আল্লাহ আমাকে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছেন। আপনার চা আমার জন্য হারাম।"

এরপর আর কথা না বলে তিনি সে স্থান ত্যাগ করে বেরিয়ে আসেন। তিনি নিঃস্বার্থভাবে নিজের অতিরিক্ত আয় অপরকে দান করে দিতেন। আইনসভার সদস্য হিসাবে যে ভাতা পেতেন তাও বিভিন্ন মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি বিতরণ করে দিতেন। হাকিম আলতাফুর রহমান নিজে বহুবার সে অর্থ মনিঅর্ডার করেছেন বলে জানিয়েছেন।

ইসলামাবাদীর সুদীর্ঘ জীবনের প্রতিটি ক্ষণই ছিল মূল্যবান। সুস্থ থাকা পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তই তিনি কাজের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর কর্মমুখর জীবন সম্পর্কে আবুল ফজল বলেন :

"এক সহজাত দুঃসাহসের অধিকারী ছিলেন মনিরুজ্জামান। যার ফলে অতসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলায় তিনি হাত দিয়েছিলেন। হাত দিয়েছেন অনেকগুলি সংবাদপত্র পরিচালনায়। স্বপ্ন দেখেছেন আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার। বলাবাহুল্য তাঁর বহু পরিকল্পনাই তাঁর জীবদ্দশায় যেমন, তেমনি আজো অসমাপ্তই রয়ে গেছে।"

হাবীবুল্লাহ বাহারও একবার বলেছিলেন :

www.pathagar.com

"মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সারা জীবন কেঁদেছেন পাগলের মত, কি হবে আমাদের ভবিষ্যৎ? মুসলমান লেখাপড়া শিখছে না, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আসছে না, খবরি কাগজ পড়ছে না। আসছে না রাজনীতি চর্চায়। উত্তর ভারতে যেমন স্যার সৈয়দ আহমদ জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজ করেছেন বাঙলায় তেমনি কাজ করবার চেষ্টা করেছেন ইসলামাবাদী। সাফল্য হয়ত আসেনি নানা কারণে, কিন্তু তিলে তিলে বিলিয়েছেন নিজেকে।"

লাহোর জেল থেকে আসার পর জীবনের এই ব্যর্থতার চিন্তায় তিনি মনে খুব আঘাত পেতেন। শরীরও তাঁর এ সময় অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে। পরে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। এবং একদিন চিরতরে আপন আত্মীয়-পরিজন ও দেশবাসীকে কাঁদিয়ে ইহলোক পরিত্যাগ করে জান্নাতবাসী হন।

ইসলামাবাদী জীবনে বহুজনের আহ্বানে বহু জায়গায় গেছেন। যেখানেই গেছেন, সেখানেই তিনি সম্মান কুড়িয়েছেন। ফিরে এসেছেন সবার প্রাণ জয় করে। তাঁর সমাজকর্ম ও রাজনীতির জীবন আজও সকলের কাছে এক বিস্ময় ও কিংবদন্তিস্বরূপ। তাঁর সাহিত্য জীবনও সাহিত্যসেবীদের কাছে পরম শ্রদ্ধার সাথে বিবেচিত হচ্ছে।

ইসলামাবাদীর শেষ ও করুণতম দিনের উল্লেখ করে তাঁর একনিষ্ঠ সহকর্মী-সেবক হাকিম আলতাফুর রহমান বলেন :

"১৯৪৫ সনে জেলের নির্জন কুঠরিতে গোপন তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে মাওলানার উপর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বেতনভুগী কর্মচারীরা নির্মম অকথ্য নির্যাতন চালায়। মুক্তির পর তাঁর শরীর ও মন অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। চিকিৎসার জন্য তিনি কলিকাতায় যান। কলিকাতা হইতে মাওলানা যে পত্র আমাকে লেখেন তা এতই করুণ ও হৃদয়বিদারক যে তার স্বাক্ষর যুগে যুগে সকল মহাপুরুষের ও মনীষীদের জীবনেই রহিয়াছে।"

সেই পত্রে রুগ্ন মাওলানা জানান :

"আমি যদি কলিকাতায় মারা যাই তবে একটা নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করিতে বলিবে। তুমি কলিকাতার সব চিন। এইখানে আসিয়া আমার কবর খুড়িয়া রেলওয়ে পার্সেলে আমার লাশ লইয়া যাইবে এবং যে স্থানে নির্দিষ্ট করিয়াছ তথায় দাফন করিবে।"

www.pathagar.com

ইসলামাবাদী শেষ জীবনে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আবুল ফজল তাঁর সেই দিনগুলির উল্লেখ করে বলেন :

"শেষ বয়সে দুরারোগ্য অর্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইসলামাবাদী সাহেব জীবনের বাকী সময়টুকু নিষ্ক্রিয়ভাবে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলেন। মনে হয় এইটিই ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃসহ কাল। কারণ কর্মীর জন্য কর্ম করতে না পারার চেয়ে বেদনাদায়ক আর কিছু হতে পারে না। সে বেদনা নিয়ে আর জীবনের বহু স্বপ্ন-সাধ অসমাপ্ত রেখে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।"

ইসলামাবাদী ছিলেন অত্যন্ত সদালাপী ও মধুর চরিত্রের লোক। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তীক্ষ্ণ মেধা ও সৎকর্মে অটুট সঙ্কল্প ও মনোবল সহজেই শত্রুকেও পর্যন্ত মুগ্ধ করতো। কোন কারণেই কিংবা কোনও প্রলোভনেই তাঁর ব্যক্তিত্বকে কোনও দিন তিনি খর্ব করেননি। বিত্তশালী মুসলমানগণ তাঁকে বাড়িতে আমন্ত্রণ করে অর্থদান করতে চাইতেন– তিনি ঘৃণার সাথে তা পরিত্যাগ করে আসতেন। নিজেও কাউকে তিনি অর্থের মানদণ্ডে বিচার করতেন না। তাঁর সেই চরিত্রের মাধুর্য ও উচ্চ আদর্শ, আত্মত্যাগ এবং সমাজ ও দেশের প্রতি ভালোবাসা জাতির অন্তরে চিরদিনই অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মাওলানা মনিরুজ্জামান অল্প-বিস্তর কবিতা চর্চাও করতেন।

তাঁর নিজের কবরের গায়ে তাঁরই লেখা কয়েক চরণ ফারসী কবিতা আর তার বাংলা অনুবাদ এখনো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। যে কোনো পথিকই সেটা দেখে থমকে দাঁড়ান ক্ষণিকের জন্যে। আর ঘুমন্ত নন, যেন জাগ্রত বীর সৈনিক মাওলানা মনিরুজ্জামানের পাশে দাঁড়িয়ে পাঠ করেন গভীর শ্রদ্ধায় তাঁরই লেখা চরণগুলি :

"পথিক, ক্ষণেকের তরে বস মোর শিরে–
ফাতেহা পড়িয়া যাও নিজ নিজ ঘরে।
যে জন আসিবে মোর সমাধি পাশে
ফাতেহা পড়ে যাবে মম মুক্তির আশে
অধম মনিরুজ্জামান নাম আমার
ইসলামাবাদী বলে সর্বত্র প্রচার।"

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com